মাধবীর জন্য

২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা থেকে
বুদ্ধদেব বসু কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন ১৩৪৯
অক্টোবর ১৯৪২

দাম ১৸৹

মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলকাতা থেকে
ব্রজেন্দ্রকিশোর সেন কর্তৃক মুদ্রিত

মাধবীর জন্য

ও

অন্যান্য গল্প

প্রতিভা বসু



কবিতা ভবন

২০২ রাসবিহারী এভিনিউ

কলকাতা

কাকু-কে

মাধবীর জন্য

হঠাৎ মাধবীর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। আমি নিউমার্কেটে ফুল কিনতে গিয়েছিলাম, দেখি এক ভদ্রমহিলা ওজন নিচ্ছেন দাঁড়িয়ে। ওজন নেবার মতনই বটে। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে একজন মেয়েমানুষের যতখানি বাড়া সম্ভব উনি ঠিক ততখানি বেড়েছেন। আগে লক্ষ্য করিনি, হঠাৎ চোখে চোখ পড়লো। সাহেবি পোষাকে সজ্জিত পুরুষটিকে দেখে ওঁকে তাঁরই স্ত্রী ভেবে পাশ কাটিয়ে চ'লে যাচ্ছিলাম, কিন্তু একটু পরেই বুঝলাম ভদ্রমহিলাটি আমাদেরই মাধবী এবং ভদ্রলোকটি মাধবীর নতুন স্বামী। স্তম্ভিত হলাম।

—'এ কী, বকুল যে।'

'বাঃ তুমি কোত্থেকে।' এই হল আলাপের সূত্রপাত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাধবী আমাকে রেহাই দিল না, জোর ক'রে নিয়ে এলো ওর বাড়িতে, বল্ল, 'আমার কথা তোমাকে শুনতেই হবে, আমি যে একটা অমানুষ বা পাষণ্ড নই সে-কথা তোমার জানা দরকার।'

বাড়িটি বেশ। একতলা ছোট বাড়ি, সাজানো গুছোনো—মাধবীর নিখুঁত হাতের ছাপ সর্বত্র। বছর দশেকের একটি মেয়েকে ও নিয়ে এলো—'মাসিমাকে প্রণাম কর, লক্ষ্মী।' আমি দুই চোখ মেলে লক্ষ্মীকে দেখতে লাগলাম—দেখতে

লাগলাম বল্লে ভুল হয়, গিলতে লাগলাম, আর আমার চোখের তলায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্মী অস্বস্তিতে ম'রে যেতে লাগলো। অবশেষে দুই হাতে ওকে কোলের উপর টেনে এনে মাথায় অজস্র চুমু খেয়ে বল্লাম, 'ওকে তো আমার কিছু দেওয়া উচিত, না, মাধবী? আমি হলাম মাসিমা!' হাত থেকে অতি প্রিয় এবং অতি দামি একমাত্র গহনা আমার হীরের আংটিটি ওর কচি নরম আঙুলে পরিয়ে দিলাম। ঢলঢল করতে লাগলো, মাধবী রাগ করতে লাগলো, কিন্তু তবু আমি কিছুতেই আর তা খুলে নিলাম না।

মাধবীর নতুন স্বামীটি দেখলাম বেশ ভালোমানুষ। চা খেতে-খেতে সামান্য আলাপ হ'লো। কথাবার্তায় অতিশয় ভদ্র এবং মার্জিত। চা খেয়েই উনি বেরিয়ে গেলেন কোথায়। মাধবী এবার ঘনিয়ে বসলো কাছে।—'লক্ষ্মী, যা তো বাবা—তোর মাসির সঙ্গে আমার কথা আছে।'—আমার বুকের মধ্যে টিপটিপ করতে লাগলো—কী বলবে মাধবী, কী কথা আছে ওর?

'তুমি নিশ্চয়ই ভয়ানক অবাক হয়েছ—'

মাথা নেড়ে বল্লাম, 'বলাই বাহুল্য।'

'তবে যে কিছু জিজ্ঞেস করছ না?'

'কিছু একটা হয়েছে।'—নেহাৎ উদাসীনভাবে কথাটা এড়াবার চেষ্টা করলাম।

'তোমার কী মনে হয়?'—আমার যা মনে হয়েছিল তা যে ঠিক নয় সে বিষয়ে যেন হঠাৎ আমি সন্দিগ্ধ হলাম। বল্লাম, 'তুমি যা বলবে বল না।'

মাধবী কথা ঘোরালো, 'আমার স্বামীকে তোমার কেমন লাগলো?'

'ভালোই ত।'

'কে বেশি ভাল—অশোক না এই ভদ্রলোক?'

এ নামটা আমার সয় না। শুনলে ভিতরে ভিতরে বিশ্রীরকম একটা যন্ত্রণা হয়। জবাব যে কী দেব ভাবতে একটু সময় নিয়ে বল্লাম, 'আমার চেয়ে তা তুমিই ভাল জান।'

মাধবী একটু চুপ ক'রে থেকে বল্ল—'তোমার সঙ্গে আমার প্রায় দশ বছর পরে দেখা, এই ক' বছরে যদি আমার স্বামীর মৃত্যু হয়ে থাকে তা কি খুব আশ্চর্য?'—একটু থেমে—'আর মৃত্যুর পরে যদি আমি বিয়ে করি সেটা কি খুব অন্যায়?' মাধবীর কথার ধরনে প্রথমে যে-বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম তা ধূলিসাৎ হলো। অশোকের মৃত্যু যে আমার পক্ষে বেদনা-দায়ক হবে এ-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ

ছিলাম কিন্তু সে-বেদনা যে এত গভীরেও নাড়া দিতে পারে তা আমি জানতাম না। অনেকদিন আগেকার আরেকটা দুঃখের স্বাদ মনে পড়লো। নতুন ক'রে অভিভূত হলাম। মুখ নিচু ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম—'কী হয়েছিল ওঁর ?'

'খুব সম্ভব যক্ষ্মা।'

'যক্ষ্মা !'

'বোধ হয়।'

মুখ তুলে বল্লাম, 'বোধ হয় কেন ? ব্যারাম কি ওঁর শেষ পর্যন্তও নির্দিষ্ট হয় নি ?'

'শেষ পর্যন্ত আমি জানিনে—কেননা আমার যখন সন্দেহ হতে স্থরু হ'লো তখনই আমি ওকে পরিত্যাগ ক'রে আসি।'

'পরিত্যাগ ?' কথাটা আমার মুখ থেকে যেন সঙ্গে-সঙ্গে খ'সে পড়লো—'তবে যে তুমি বল্লে অশোকের মৃত্যু

'পরিহাস করেছি।'

'এ-সব নিয়েও কি পরিহাস তোমার আসে ?'

'স্বচ্ছন্দে। আমাকে নিয়েই বা অশোক কম পরিহাসটা করলো কী !'

'অশোক বেঁচে আছে ?'

'তাই তো জানি।'

ন'ড়ে চ'ড়ে সহজ হয়ে ব'সে বললাম, 'তবে ওঁর জীবদ্দশায় মেয়েকে তুমি পেলে কী ক'রে ?'

'সেটুকু দয়া করবার উদারতা ও শেষ পর্যন্ত দেখিয়েছিল আমাকে।' নিঃশ্বাস ফেলে নীরবে ব'সে রইলাম। মাধবী বলতে লাগলো, 'অশোকের সঙ্গে বিয়ে হবার পরে আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলাম ভাঙা আর জুড়বে না, তালি আর টিঁকবে না। খুব অবাক হবে এবং বিশ্বাসও করবে না হয়তো যে বিয়ের পরে পুরো চার বছর আমরা একসঙ্গে ছিলাম কিন্তু একদিনের জন্যেও আমরা একসঙ্গে শুইনি। প্রত্যেক রাত্রে একই ঘরে পাশাপাশি খাটে দু'জনে দু'জনের নিঃশ্বাস শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছি। একদিন আমি সারারাত কেঁদেছিলাম, আর সারারাত চুপ ক'রে ব'সে ও আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিল। আমি বল্লাম, "এরকম যন্ত্রণা কি জীবন ভ'রেই পাব ?" বল্লে, "কেন, আমি কি তোমাকে কষ্ট দিই, আমি কি ভালো ব্যবহার করিনে ?"

'কাঁদতে-কাঁদতে বল্লাম, "ভয়ানক কষ্ট দাও—ভালো যদি নাই বাসবে তবে কেন এ-রকম করলে ?"

'বিষন্ন মুখে বল্ল, 'মাধবী, আমি লম্পট, আমি পাপিষ্ঠ কিন্তু আমারো তো হৃদয় আছে, আমারো তো সুখ অনুভূতি আছে—অনুতাপ আছে। কয়েকটা দিন, দিন অন্তত আমাকে তুমি ভিক্ষা দাও—একলা থাকার দাও।"—দুই হাতে মুখ ঢেকে উপুড় হ'য়ে ও কাঁদতে লাগলো পাগলের মতো। আমি হাত ধ'রে উঠিয়ে বসালাম, শান্ত করলাম—বল্লাম, "অশোক, আর আমি তোমাকে পীড়ন করবো না, যেদিন মনে পড়বে আমার কথা সেদিনই তুমি আমার কাছে এসো, আমাকে ডেকো—কিন্তু দায়ে প'ড়ে ভালোবাসার ভাণ দেখিও না, সে আমার সইবে না।"

'তার পরদিনই আমি মার কাছে চলে এলাম।'

'টানা ছ'মাস ছিলাম কিন্তু তবুও সে আমাকে ডাকলো না। ফিরে যেতে সে লিখেছিল, কিন্তু আমি জানতাম সেটা তার একান্তই আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্যে। স্ত্রীকে পিত্রালয়ে ফেলে রাখতে তার রুচিতে বেধেছিল। আমি ফিরে গিয়ে তার একটুও পরিবর্তন দেখলুম না। তবে শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলে কী হত জানিনে, কেননা শেষের দিকে আমাকে যেন ও ভালোবাসতে সুরু করেছিল মনে হত। কিন্তু আমি তার অবসর দিলাম না। অনেকদিন এমন

হয়েছে যে শুতে এসে দেখেছি আমার বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে মেয়ে নিয়ে খেলা করছে। বলেছি, "ওঠো, এবার আমি শোব।" হাত দিয়ে নিজের পাশে দেখিয়ে দিয়েছে, "শোও না।" "ধ্যেৎ!"—আমি অমনি প্রতিবাদ করেছি। "তবে কিন্তু মেয়ে নিয়ে যাবো।" "অনায়াসে," সাংঘাতিক ঠাণ্ডাভাবে আমি জবাব দিয়েছি।

' "ঈস্", অশোক হেসে বলেছে—"মেয়ে যদি সত্যিই নিয়ে যাই তখন আর ফুটুনি খাটবে না। তার চেয়ে লক্ষ্মী মাঝখানে শুয়ে থাক্, আমি আর তুমি দু'পাশে শুয়ে থাকি।"

' "পাগল!" আমি আমলেই আনিনি কথাটা।

'নিঃশ্বাস ফেলে ও উঠে গেছে নিজের বিছানায়, আর আমি শুয়ে-শুয়ে চিন্তা করেছি কেন আমার এই প্রতিশোধ নেবার এমন দুরন্ত অভিলাষ? বিবেক বলেছে এত দম্ভ ভালো নয়,—কিন্তু তবু আমি নিজেকে খর্ব ক'রে ওর ডাকে সাড়া দিতে পারিনি, কেননা এটুকু আমি স্পষ্টই বুঝতে পারতাম এখনো ও সম্পূর্ণভাবে তোমাকে ভোলেনি, ক্ষতের উপর সামান্য একটা প্রলেপ পড়েছে মাত্র। আর সেই প্রলেপটি হচ্ছে আমাদের সন্তান। অপমানের কথা নয়,

তবু সন্তানের জন্যই আমার মূল্য এ-কথা ভাবলে আমার দাহ হত। ঠিক এই রকম সময়ে বিনয়বাবুর সঙ্গে দেখা। বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন খনিবিদ্যা শিখে। মেজদার সতীর্থ, সেই সূত্রে আলাপ হ'তে-হ'তেই যে কেমন ক'রে এত সহজে ঘনিষ্ঠতায় দাঁড়িয়ে গেল তা নিজেও বুঝতে পারলাম না। প্রথম-প্রথম কিছুটা ভাণ করতাম অশোককে দেখিয়ে, মনে হ'ত অশোকের ঈর্ষাবৃত্তিটা হয়তো জেগে উঠবে এ দেখে এবং ও কষ্ট পাবে, কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য—তা ও পেতো না, বরং আমার ন্যাকামির আভাস পেলেই ও স'রে পড়তো সেখান থেকে। শেষ পর্যন্ত দেখি আমার ভাণকে বিনয়বাবু সত্যি মনে ক'রে ব'সে আছেন, আর আমারও মনে হ'ল আমি অশোককে কখনোই ভালোবাসিনি—স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীর ভালোবাসা না পাওয়ার মত পরাজয় আর নেই—আমি এতদিন সেই গ্লানিতেই পুড়ে-পুড়ে সারা হয়েছি। আজ আমার দুয়ারে সত্যি-সত্যিই যে প্রার্থী তাকে আমি ফেরাবোই বা কেন। বঞ্চিত হবার জন্য জীবন নয়—বঞ্চনা যে করে তাকে পুজো করবার জন্যও জীবন নয়। সুখ চাই সমৃদ্ধি চাই প্রেম চাই—কেন প'ড়ে থাকবো এখানে। কী আছে অশোকের, কী পেয়েছি আমি ওর কাছে থেকে। মনকে

শক্ত ক'রে ফেল্লাম আমি। একদিন রাত্তিরে ঘুমুতে গিয়ে বল্লাম, "তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।" বই পড়ছিল শুয়ে-শুয়ে—মুখ তুলে তাকালো। আমি বল্লাম, "আর কতকাল ভার হয়ে থাকবো—তুমিই বা আর কতকাল তা বইবে!" "কী হলো তোমার?" অত্যন্ত মধুর ক'রে ও হাসলো।

'তুমি তো জানো হাসলে ওকে কী আশ্চর্য ভালো লাগে, মুহূর্তের জন্য মনটায় একটু মোহ এলো, আমল দিলাম না। অত্যন্ত সহজভাবে বল্লাম, "বিনয়বাবু আমাকে ভালোবাসেন, তা বোধ হয় তুমি জানো না।"

' "জানি—" কথাটা ব'লেই বইয়ে চোখ ডোবালো, আর আমি স্তব্ধ হয়ে চুপ ক'রে রইলাম। তারপর বুঝতেই পারো—মাস ছ'য়েক এইভাবে চল্ল, আর তারপর একদিন ওঁকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে এলাম। সমস্যা হয়েছিল মেয়ে নিয়ে—অশোক নিজে থেকেই বল্ল, "বিনয়বাবু রাজি থাকলে মেয়ে দিতে আমার আপত্তি নেই। আমার আয়ু হয়তো শেষ হ'য়ে এসেছে কেননা ভিতরে-ভিতরে আমি বড় শ্রান্ত, আমার এই ঘুষঘুষে জ্বর আর ঘুরে ঘুরে কাশি, এটা আমার ভালো মনে হয় না, এজন্যেও লক্ষ্মীকে সরানো দরকার।" '

তবু সন্তানের জন্মই আমার মূল্য এ-কথা ভাবলে আমার দাহ হত। ঠিক এই রকম সময়ে বিনয়বাবুর সঙ্গে দেখা। বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন খনিবিদ্যা শিখে। মেজদার সতীর্থ, সেই সূত্রে আলাপ হ'তে-হ'তেই যে কেমন ক'রে এত সহজে ঘনিষ্ঠতায় দাঁড়িয়ে গেল তা নিজেও বুঝতে পারলাম না। প্রথম-প্রথম কিছুটা ভাণ করতাম অশোককে দেখিয়ে, মনে হ'ত অশোকের ঈর্ষাবৃত্তিটা হয়তো জেগে উঠবে এ দেখে এবং ও কষ্ট পাবে, কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য—তা ও পেতো না, বরং আমার ন্যাকামির আভাস পেলেই ও স'রে পড়তো সেখান থেকে। শেষ পর্যন্ত দেখি আমার ভাণকে বিনয়বাবু সত্যি মনে ক'রে ব'সে আছেন, আর আমারও মনে হ'ল আমি অশোককে কখনোই ভালোবাসিনি—স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীর ভালোবাসা না পাওয়ার মত পরাজয় আর নেই—আমি এতদিন সেই গ্লানিতেই পুড়ে-পুড়ে সারা হয়েছি। আজ আমার দুয়ারে সত্যি-সত্যিই যে প্রার্থী তাকে আমি ফেরাবোই বা কেন। বঞ্চিত হবার জন্য জীবন নয়—বঞ্চনা যে করে তাকে পুজো করবার জন্যও জীবন নয়। সুখ চাই সমৃদ্ধি চাই প্রেম চাই—কেন প'ড়ে থাকবো এখানে। কী আছে অশোকের, কী পেয়েছি আমি ওর কাছে থেকে। মনকে

শক্ত ক'রে ফেল্লাম আমি। একদিন রাত্তিরে ঘুমুতে গিয়ে বল্লাম, "তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।" বই পড়ছিল শুয়ে-শুয়ে—মুখ তুলে তাকালো। আমি বল্লাম, "আর কতকাল ভার হয়ে থাকবো—তুমিই বা আর কতকাল তা বইবে!" "কী হলো তোমার?" অত্যন্ত মধুর ক'রে ও হাসলো।

'তুমি তো জানো হাসলে ওকে কী আশ্চর্য ভালো লাগে, মুহূর্তের জন্য মনটায় একটু মোহ এলো, আমল দিলাম না। অত্যন্ত সহজভাবে বল্লাম, "বিনয়বাবু আমাকে ভালোবাসেন, তা বোধ হয় তুমি জানো না।"

' "জানি—" কথাটা ব'লেই বইয়ে চোখ ডোবালো, আর আমি স্তব্ধ হয়ে চুপ ক'রে রইলাম। তারপর বুঝতেই পারো—মাস ছ'য়েক এইভাবে চল্ল, আর তারপর একদিন ওঁকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে এলাম। সমস্যা হয়েছিল মেয়ে নিয়ে —অশোক নিজে থেকেই বল্ল, "বিনয়বাবু রাজি থাকলে মেয়ে দিতে আমার আপত্তি নেই। আমার আয়ু হয়তো শেষ হ'য়ে এসেছে কেননা ভিতরে-ভিতরে আমি বড় শ্রান্ত, আমার এই ঘুষঘুষে জ্বর আর ঘুরে ঘুরে কাশি, এটা আমার ভালো মনে হয় না, এজন্যেও লক্ষ্মীকে সরানো দরকার।" '

মাধবী চুপ করলো, সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের মধ্যে এমন একটা নিস্তব্ধতা এলো যে আমি ভয়ংকর অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'লক্ষ্মী তখন কত বড় ?'

ভাঙা-ভাঙা গলায় মাধবী বল্ল, 'চার বছরের'—একটু থেমে বল্ল, 'প্রথমটা খুব কাঁদত বাপের জন্যে, কিন্তু বিনয়বাবু অসাধারণ লোক, তিনি স্নেহ দিয়ে প্রেম দিয়ে আমাদের মা মেয়েকে একেবারে ভ'রে রেখেছেন।'

আমার গলা দিয়ে আওয়াজ আসছিল না—কেশে বল্লাম, 'অশোক এতদিনও বেঁচে আছে কিনা কী ক'রে জানলে ?'

'পরশু কাগজে কি দেখনি তার ছবি বেরিয়েছে—সমস্ত সম্পত্তি সে গরিব ছাত্রদের বৃত্তির জন্য দান করেছে, বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকার সম্পত্তি।'

না ব'লে পারলুম না, 'মাধবী, ছবিটা একটু দেখাতে পারো ?' মাধবী তক্ষুনি উঠে ভিতরের ঘর থেকে কাগজখানা নিয়ে এলো, ছবিটার দিকে তাকাতে আমার ভয় করছিল, একটুখানি চোখ বুলিয়েই এ-কথা সে-কথার পরে অনেক সংকোচ নিয়ে বল্লাম, 'তোমার তো প্রয়োজন নেই বোধ হয়, ছবিটা আমি নিলে কি ক্ষতি হবে ?'

মাধবীর মনের ইচ্ছা বোঝা গেলো না, কিন্তু সহজভাবেই সে ছবিটা আমাকে দিল। তারপরে আর বেশিক্ষণ সেখানে আমি ছিলাম না। হস্টেলে ফিরে এসেই অত রাত্তিরে স্নান করলাম, তারপর খাব না ব'লে এসে ঘরে শুয়ে রইলাম। সমস্তটা রাত্তির একবিন্দু ঘুম এলো না, জানালা দিয়ে রাস্তার আলো আসতো ব'লে জানালাটা বন্ধ ক'রেই রাখতাম রোজ, মধ্যরাত্রিতে উঠে সেটা খুলে দিলাম, তারপর আবছা আলোতে সন্তর্পণে ব'সে বার-বার দেখতে লাগলাম অশোকের ছবিখানা। ছবিখানা বোধ হয় বর্তমান চেহারার, তাই এমন বিবর্ণ বিষণ্ণ। মনের মধ্যে গুমরে উঠতে লাগলো কত কথা, তন্নতন্ন ক'রে যাচাই করতে লাগলাম কী সুখ আমি পেয়েছি এ জীবনে। মা নেই, বাপ নেই—সাতকুলে কেউ নেই। দুটো ছোট বোন আছে, তাদের তো কোন জন্মে বিয়ে হয়ে গেছে, দেখাও হয় না। থার্ডক্লাশে উঠেই মাষ্টারি ক'রে-ক'রে পড়তে হয়েছে। মা বাবার মৃত্যুর পরে কাকার আশ্রয়ে দু'বছর ছিলাম কিন্তু দুটো যুগও মানুষের এর চেয়ে সহজে কাটে। কাকিমা মানুষ ভাল ছিলেন, কিন্তু কাকা একটি মূর্তিমান শয়তান। আমরা তিন বোনে তাঁর কাঁধে যে কী ভীষণ বোঝা এ-কথা তিনি দিনে অন্তত তিরিশবার

শোনাতেন এবং ঝি চাকর রাখবার আর তাঁর ক্ষমতা নেই. ব'লে আমাদের দিয়ে সব কাজ চালাতেন। কোনোরকমে ম্যাট্রিকটা পাশ ক'রেই আমি বোনেদের নিয়ে হস্টেলে এসে উঠলাম। দিনে তিনটে টিউশানি ক'রে তবে বোনেদের খরচ চালিয়েছি, কাকার অর্ধপয়সাও আর গ্রহণ করিনি। আই. এ. পাশ ক'রে যখন বি. এ.-তে ভর্তি হলাম, তখন আমার বন্ধুতা হয় মাধবীর সঙ্গে। সে-বন্ধুতা এমন প্রগাঢ় হয়েছিল যে মাধবীর মা বাবার সঙ্গেও শেষ পর্যন্ত আমার একটা সম্বন্ধ হয়ে গেল।

আমি তখন বাইশ বছরের মেয়ে, বিদ্যাসাগর কলেজে থার্ড-ইয়ারে পড়ি। সেই হস্টেলেই বোনেদের নিয়ে থাকি এবং সকাল সন্ধ্যা দুটো টিউশানি করি। একদিন সন্ধ্যাবেলা টিউশনি সেরে ফেরবার পথে মাধবীদের বাড়ি গিয়ে দেখলাম মাধবীর মা বসবার ঘরে একটি যুবকের সঙ্গে ব'সে কথা বলছেন। আমি যেতেই বল্লেন, 'ওমা, তুই জানিস না বুঝি, মাধবী তো চুঁচুড়া গেছে ওর পিসি-বাড়ি।' আমি সঙ্কুচিত-ভাবে দরজায় দাঁড়িয়েই বল্লাম, 'তাই নাকি ?'

'তাই ব'লে কি ঘরেই ঢুকবিনে নাকি ?'—মাধবীর মা সস্নেহে আমাকে ডেকে আনলেন তারপর যুবকটির দিকে

'থাকি না বটে, কিন্তু আসি প্রায় রোজই। তাছাড়া, সম্প্রতি দিনকয়েক তো এখানেই আছি। আসুন না এর মধ্যে আর একদিন ?"

'আচ্ছা'—নমস্কার ক'রে বিদায় নিলাম।

অবিবাহিত যুবক দেখলেই আমার তার সম্বন্ধে কৌতূহল হয়, কেননা সম্প্রতি আমার বোনের বিবাহ দেবার কথা আমি ভাবছিলাম। এদের হু'বোনের বিবাহ দিয়ে উঠতে পারলে আমার অনেক কষ্টের লাঘব। ছোটটি পনেরো বছরের, থার্ড ক্লাসে পড়ছিল, কিন্তু তার উপরেরটির সতেরো তো হল। বিয়ের পক্ষে এমন সুন্দর বয়স আর নেই, সবে কুঁড়ি ফুটেছে। মাঝে-মাঝে ওকে ঠাট্টা ক'রে দেখেছি ও খুব উপভোগ করে। ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছিল, একটা টিউশনিও করে—নিজে এত কষ্ট করছি ব'লে ওর কষ্টটা আমার লাগে বেশি। আমি বড়, দায়িত্ব আমার, ওকে কেন কষ্ট করতে দেব। বাণী তা শোনে না, তাই আমি ভেবেছি ওকে এখনি বিয়ে দিয়ে দেব।

বাণী বলে, 'বিয়ে তো দেবে কিন্তু পয়সা পাবে কোথায় ?' —কথাটা ভাববার মতই, কিন্তু এমনো তো মানুষ আছে যারা পয়সা নেয় না। তাছাড়া মার গহনা আমরা কিছু

পেয়েছিলাম। সাবেকি—তাই শুধুই সোনা। তিন বোনেরটা দিয়ে এক বোনকে নিশ্চয়ই পার করা যাবে। বাণী বলে, 'নিজের কথা তো তুমি ভাবই না, কিন্তু রাণীকেও তো বিয়ে দিতে হবে?' 'ওঃ রাণী! রাণীর জন্য ভাবনা নেই, ও বড় হ'তে-হ'তে আমি বি. এ. পাশ ক'রে একটা ভাল চাকরি পাবই, তারপর না-খেয়ে টাকা জমাবো।' বাণী ভবিষ্যৎ শুনে হাসে।

অশোককে দেখে আমার মনে কেমন একটা আশা হ'লো। পরের দিন মাধবীকে কলেজে বল্লাম কথাটা। আমার যদি অন্তর্দৃষ্টি থাকতো তবে দেখতাম মাধবীর মুখ সাদা দেখাচ্ছে, কিন্তু নিজের চিন্তাতেই আমি বিভোর। মাধবী বল্লে, 'ক্ষেপেছিস্—বাপের এক ছেলে—গাড়ি বাড়ি দাসদাসী নিয়ে মশগুল—সে কি আর অনাথ নিয়ে উদারতা দেখাবে?'—ভয়ানক আঘাত লাগলো মাধবীর কথায়। চাপতে চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমার মুখ গম্ভীর হ'লো, না-ব'লে পারলাম না, 'অনাথ মানে—রাস্তার ভিখিরিও নয়, কারো কৃপাপ্রার্থীও নয়।'

মাধবী অপ্রস্তুত হ'লো। যদিও কিছু না-ভেবেই ফস্ ক'রে কথাটা ব'লে ফেলেছিল, তবু আমার মর্মমূলে তা এমন বিদ্ধ হ'য়ে গেল যে মাধবী অনেকবার ক্ষমা চেয়েও তা আর উপড়ে আনতে পারলো না। বুঝতে পারলো আমার মন মেঘমুক্ত

া সহজ হবে না, তাই হয়তো ভাবলো মার হাতে ফেলে
য়াই বুদ্ধিমানের কাজ—অগত্যা পরের দিন ওদের বাড়িতে
নিমন্ত্রণ করে চ'লে গেল বিষণ্ণ মনে।

আবার আমার সঙ্গে অশোকের দেখা হল।

প্রায় সমস্ত দিনটাই ওখানে কাটিয়ে যখন হস্টেলে ফিরে এলাম তখন কেবলি মনে হ'তে লাগলো এত তাড়াতাড়ি দিন কাটলো কেমন ক'রে? আর আমিই বা এত শিগ্‌গির চ'লে এলাম কেন? ঘর থেকে ঘরে, বারান্দা থেকে বারান্দায়, জানালা থেকে জানালায় এমন চঞ্চল পায়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম যে হস্টেলের প্রত্যেকটি মানুষ আমার ভাবান্তরে অবাক হ'য়ে চেয়ে রইল।

বড়মানুষের ছেলেদের সাধারণত যা হ'য়ে থাকে, অশোকেরও ঠিক তাই হয়েছিল। বাপ মাইকার ব্যবসা ক'রে প্রচুর অর্থোপার্জন করেছিলেন। চেহারা ভাল আর বাপের টাকা আছে এটাই তো শ্রেষ্ঠ গুণ—উপরন্তু ওর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রি ছিল ব'লে যে-কোনো যুবতী মেয়ের মায়ের মনোহরণ ক'রে বহু মেয়ে নিয়ে খেলবার একটা অনায়াস অবকাশ ও পেয়েছিল। আমাদের মাধবী তখন ওর নতুনতম আবিষ্কার। ঠিক এই সময়েই আমাদের দেখা। কী যে

নেশা হ'লো জানি না, আমি ওকে প্রশ্রয় দিলাম এবং কয়েক দিনের মধ্যেই এমন হ'লো যে দেখা না হ'লে আমাদের আর দিন কাটতো না। প্রথম প্রথম মাধবীদের ওখানেই চলছিল, কিন্তু সেটা সুবিধের হ'লো না, শেষে কোনোদিন গড়ের মাঠে, কোনোদিন সিনেমায়, কোনোদিন গঙ্গার ধারে, কখনো বা ট্যাক্সিতে—এই ক'রে-ক'রে দিন কাটতে লাগলো। মাসখানেক পরে ও একদিন বল্ল, 'বকুল, আমাকে কি তোমার কখনোই খারাপ লোক মনে হয়েছে?'

নিঃসংশয়ে বল্লাম, 'না'।

'আমাকে ভালো ক'রে জানবার অবকাশ তুমি পাওনি, তাই। তোমাকে যেদিন প্রথম দেখলাম সেদিনই মনে হয়েছিল আর সকলের মত এ-অবকাশ আর তোমাকে দিতে পারবো না, আমার মধ্যে যা মেকি তা সমস্তই এবার পুড়ে যাবে তোমার উত্তাপে। অনেকে অনেক বলতে পারে —যদি শোনো মন খারাপ কোরো না। তোমার কাছে যে-রূপ সেই তো আমার আসল।'

কথা বলতে-বলতে ও কেমন বিষণ্ণ হ'য়ে গেল। আমি বল্লাম, 'তুমি কি ভাবো আমার মন এতই কাঁচা—লোকের চোখ দিয়ে আমি যাচাই করবো তোমাকে?'

'হ'তেও তো পারে ?'

'কখনোই না।'

'আচ্ছা ধরো, কোনো সূত্রে যদি জানতে পারো যে আমি দেবতার ছদ্মবেশে একটি শয়তান—'

'থামো, থামো'—আমি ব'লে উঠলাম—'আর বিনয়ে কাজ নেই। তাছাড়া শয়তানকেও তো মানুষ ভালোবেসে ফেলতে পারে। জানো না রবীন্দ্রনাথের কথা "খোকা ব'লেই ভালোবাসি ভালো ব'লেই নয়"।'

ও বল্ল, 'তবু আমি আশ্বাস পাচ্ছিনে, বকুল। বকুল, তুমি বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে ঠকাইনি, আমার সমস্ত প্রাণে-মনে আমি তোমাকে গ্রহণ করেছি।' এমন ব্যাকুলতা ছিল কথাগুলোতে যে আমি বলবার কিছু খুঁজে পেলাম না। চুপ ক'রে ব'সে রইলাম অনেকক্ষণ, তারপর ফিরে এলাম হস্টেলে।

তার দিন কয়েক পরে একটু বিষণ্ণ মুখে বল্ল, 'বকুল, আমাকে বোধ হয় শিগ্ গিরই বাইরে যেতে হবে।'

'কেন ?'

'বাবার বাত হয়েছে, ডাক্তাররা তাঁকে নিয়ে পুরী যেতে বলেন।'

'ও।'

আমার এই সংক্ষিপ্ত জবাবে ও সুখী হ'লো না—একটু অপেক্ষা ক'রে বললে, 'আর কিছু বলছ না যে?'

'কী বলবো?'

'কেন, বলবার কি কিছুই নেই?'—মৃদু হাসলাম, জবাব দিলাম না।

'না না—ও-রকম বিমর্ষ হ'লে চলবে না।' অধীর আগ্রহে ও আমার হাত ধ'রে নাড়া দিল। আমি বল্লাম, 'খবরটা কি আমার পক্ষে খুব হর্ষ করবার মত?'

'ও, তাই!' একটু থেমে—'কিন্তু দুঃখ করবারও বোধ হয় কিছু নেই, কী বলো? তোমাকে তো কম জ্বালাই না আমি। কিছুদিন—'

'নাও, ছেলেমানষি কোরো না'—প্রায় ধমকে উঠ্‌লাম—'এখন যে আমাদের কত ভাববার দিন এসেছে তাও কি তোমাকে ব'লে দিতে হবে?'

'ভাবনা আবার কী। বাবাকে বলবো, মত দিলে ভালো, না-দিলেও ক্ষতি নেই—তোমার অনুমতি পাওয়া দিয়েই হচ্ছে কথা।—কিন্তু বকুল, একটা কথা—'

'বলো—'

'মানে—এই—' অনেক ইতস্তত ক'রে থেমে-থেমে ও বল্ল, 'বলছিলাম কী, মাধবীরা কি এসব জানে?'

'খুব সম্ভব না—আর জানলেই বা কী।'

'না, না, খবরদার'—অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে অশোক ব'লে উঠলো। আমার তা ভালো লাগলো না, বল্লাম, 'কেন বলো তো?'

'না, কারণ কিছুই নেই, তবে ওরা আমাকে আশা করেছিলেন এই আরকি।'

হঠাৎ আমার মাধবীর কথা মনে হ'লো, 'বড়লোকের ছেলে বাড়ি গাড়ি দাসদাসী নিয়ে মশগুল, সে আর অনাথ নিয়ে উদারতা দেখাবে না।' প্রতিহিংসার একটা আনন্দ বিদ্যুতের মত খেলে গেল হৃদয়ের মধ্যে।

বল্লাম, 'অশোক, তোমাকে বলাই ভালো—দ্যাখো, আমি একান্তই নিঃসম্বল মেয়ে, বাপ দাদার সাহায্য কী বস্তু তা আমার জানা নেই—মাধবীর ভাষায় নিতান্ত অনাথ,—এখনো সময় আছে ভেবে দেখবার—' বলতে-বলতে আমি অশোকের দিকে তাকিয়ে দেখলাম আমার কথায় ওর মন নেই, অন্য দিকে তাকিয়ে গভীরভাবে কী চিন্তা করছে।

'কী ভাবছ?'

'উঁ'—হঠাৎ যেন জেগে উঠলো। 'না, বলছিলাম কী'—সেই পূর্ব কথারই জের টেনে বললো, 'পাঁচজনকে জানাবার দরকারই বা কী, আর দেরিই বা মিছিমিছি করছি কেন?'

'দেরি মানে?'—আমি অবাক হ'য়ে বল্লাম, 'তুমি মনে-মনে কী যেন ভাবছ।'

'বকুল, আমার যেন মনে হয় পুরী থেকে ফিরে এসে আর তোমাকে পাবো না, তার চেয়ে এসো কালকেই আমরা নোটিশ দিয়ে আসি, তারপর যে ক'রেই হোক, আর পনেরো দিন আমি বাবাকে ঠেকিয়ে রাখবো—একেবারে রেজিস্ট্রি ক'রে শেষে পুরী যাব।'

'পাগল!'—আমি আমলই দিলাম না কথাটায়। 'এ কি সম্ভব নাকি?' আমার টাকা কোথায়? তা ছাড়া দু'টো বোন মাথার বোঝা। কত দায়িত্ব, কত ভাবনা, ছুট্ ক'রে একটা বিয়ে করলেই হ'লো নাকি?'

'তোমার আবার বাড়াবাড়ি'—অধীর হ'য়ে অশোক বল্ল। 'টাকার জন্য যদি আবার ভাবনাই করবে তবে এ অভাগাকে দিয়ে হবে কী? আর রাণী বাণী? বেশ তো, তোমার কাছেই থাকবে ওরা।'

'আরে না, না, আমার অবস্থা তুমি বুঝবে না—আজন্ম সুখে লালিত তুমি, যখন যা ভাবো নিমেষেই তা করতে পারো, কিন্তু আমি—

অশোক দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ ক'রে গেল।

তার দু'দিন পরে ও পুরী চ'লে গিয়েছিল। যাবার আগে একটা মাস ওকে নিয়ে আমি এমন মত্ত হ'য়ে ছিলাম যে অন্যদিকে মন দেবার আর আমার অবকাশ ছিল না। মাধবী কলেজে আসতো না, শুনেছিলাম ওর অসুখ। এবার মনে হ'লো খুব অন্যায় করেছি। সেদিনই বিকেলে টিউশানির পরে ওকে দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখলাম বাড়ি ফাঁকা—শুনলাম আজ প্রায় পনেরো দিন ওরা কোথায় গেছে, কবে ফিরবে তাও কেউ জানে না। মনে-মনে যেন কেমন একটা মুক্তি পেলাম। আমার কেবলি ভয় হচ্ছিলো ওরা বুঝি সব জেনে ফেলেছে—ওদের দেখা না-পেয়ে দুঃখিত হবার অবকাশ আর আমার হ'লো না।

অশোক গিয়ে আমাকে রোজ একখানা চিঠি লিখতে লাগলো। জীবনে চিঠি লেখা বা পাওয়া কী বস্তু তা আমার অভিজ্ঞতায় এই প্রথম। আমি পেরে উঠতাম না ওর সঙ্গে। শেষে মাস দেড়েক পরে মনে হ'তে লাগলো

এখনো যদি অশোক ফিরে না আসে আমিই বুঝি চ'লে যাবো ওখানে। দিন আর কাটে না—রাত্রে ঘুমুতে পারিনে।' লিখলাম, 'অশোক, তুমি তখন যা বলেছিলে তাতে সম্মত না-হ'য়ে ভুল করেছি, চিরটা দিন কেবল ভেবে-ভেবে আমার স্বভাবই গেছে খারাপ হ'য়ে, সব বিষয়েই আমার ভাবনার বাড়াবাড়ি। তুমি নেই, এখন তো আমার দিন কাটে না। তুমি কি আমাকে আরো কষ্ট দেবে?'

এর দিন দশেক পরেই ও ফিরে এলো কলকাতায়। দেখা হ'তেই বল্ল, 'বকুল, বাবা কিন্তু খুব খুশি হয়েছেন। একদিন তোমাকে যেতে হবে বাবার কাছে। আর ওঁর ইচ্ছে বিবাহটা হিন্দুমতে হয়।'

মুখে বল্লাম, 'ভালোই তো'—কিন্তু মনে আবার চিন্তা এলো। আমার বিবাহ আমাকেই যেখানে দিতে হচ্ছে সেখানে রেজিস্ট্রিই উৎকৃষ্ট পন্থা। কোথায় নেব বাড়ি, কে আসবে কনে সাজাতে, কে করবে সম্প্রদান, কে কিনবে বিবাহের দান-সামগ্রী—এ-সব বিলাস কি আমার মত নিঃস্ব মেয়ের জন্য? হিন্দুমতে বিবাহ ব্যাপারটাই আসলে বড়-লোকের জন্যে, যাদের টাকা এত বেশি আছে যে খরচ

না করলে আর ধরছে না ঘরে, তাদের জন্যে। তা নয় তো এক রাত্তিরের একটা সামান্য আমোদের জন্য হাজারে হাজারে টাকা কী ক'রে মানুষ অকাতরে খরচ করতে পারে? অশোক বল্ল, 'আজকে ধরো আষাঢ় মাসের সাতাশে —শ্রাবণ মাসের আঠারো তারিখেই একটা বিবাহের দিন আছে।'

'ওরে বাবা, একেবারে দেখছি তারিখও মুখস্থ ক'রে এসেছ।'

'তবে কী—তোমার কি এখনো আরো কিছুদিন ভাবতে হবে নাকি?'

'ভাবনার অবসান তো ক'রেই ছিলাম', হেসে-হেসে সত্যি কথাটাই বল্লাম। 'নতুন ক'রে ভাববার খোরাক তো তুমিই জোগালে।'

'কেন বলো তো?'

'বাঃ, হিন্দুমতে বিয়ে, সে কি একটা সামান্য কথা? কোথায় রে বাড়ি, কোথায় রে টাকা—কেনো লাঠি, কেনো ছাতা, বাসন, কোসন—'

'নাও, ভারি তোমার গরব। দৈন্য না-দেখিয়ে কাজের কথা শোনো তো। কাল রোববার। সকালবেলা আমি

আবার আসবো—তোমাকে নিয়ে যাবো আমাদের বাড়ি। রাণী বাণীও যাবে।'

'ওদের আর কেন—ও-বেচারারা এখনো জানে দিদি তাদের জন্যেই ব্যবস্থা করছে—'

'আহা, ওরা কি আর কিছু বোঝে। নেহাৎ খুকি কিনা।'

'তা মুখোমুখি যখন কিছু বলেনি তখন নেপথ্যে থাকাই ভালো।'

'বেশ, যা ভালো বোঝো কোরো, কিন্তু প্রস্তুত থেকো মোটমাট।'

পরের দিন বেলা প্রায় আটটার সময় ও আমাকে নিয়ে গেল। গাড়িতে ব'সে সাংঘাতিক ঝগড়া, কেন আমি সাদা শাড়ি প'রে এলাম। আমি ছেলেবেলা থেকেই শস্তা-দামের মিলের সাদা শাড়ি প'রেই অভ্যস্ত—নিজে উপার্জন করবার পরে কখনো-কখনো যে সখ না হত এমন নয়, কিন্তু দু'টি ছোট বোন আছে, কেন্‌বার সমস্ত সখ ওদের দিয়েই মেটাতে হ'তো। তাই সত্যি বলতে আমার ছিলই না রং করা কোনো ভালো শাড়ি। বলতে গিয়ে তাড়া খেলাম এবং গাড়ির মোড় ফিরলো অন্যদিকে। শাড়ির দোকানে এসে গাড়ি থামতেই আমার মুখ লাল হ'য়ে

উঠলো। কারো কাছে কখনো পাইনি, কাজেই কেউ কিছু দিতে চাইলে সেটা মনে হ'তো দয়া। অনর্থক ঘা লাগলো আত্মসম্মানে, বল্লাম, 'ছি, ছি, এটা তোমার বোঝা উচিত অশোক, এখনো আমি তোমার স্ত্রী হইনি, আমার জন্য উপহার কেনা তোমাকে মানায় না।' আমার কথা না-শুনে তবুও নামতেই আমার মুখের ভাব বদলে গেল। বল্লাম, 'অশোক, আমাকে গরিব পেয়ে অপমান করছো?'

'অপমান! তোমাকে!'—অশোকের মুখ মুহূর্তে বিবর্ণ দেখালো। নিঃশব্দে উঠে এসে গাড়িতে বসলো, আর দ্বিতীয় কথা আমাদের হ'লো না গাড়িতে।

ওদের বাড়ি এসে পৌঁছতেই বছর আঠারোর একটি মেয়ে এসে আমাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে গেল ঘরে। কার্পেট-মোড়া সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়—উপরের সিঁড়িতে লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক। অশোক বল্ল, 'আমার বাবা, প্রণাম করো।' ভদ্রলোককে আমি জীবনে ভুলবো না। অমন অদ্ভুত স্নেহমাখা কণ্ঠস্বর আমি কখনো কোনো মানুষের শুনিনি—মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ ক'রে বল্লেন, 'থাক্ মা।' যে-ঘরখানায় গিয়ে বসলাম সেখানা বুঝলাম আমার জন্যেই

বিশেষরূপে সাজানো হয়েছে। প্রায় মাটি সমান নিচু বিরাট একটি তক্তাপোষে ধব্‌ধবে সিল্কের পুরু চাদর পাতা—তার পাশে পাশে চোখ-ঝলসানো ব্রোকেডের তাকিয়া—মাঝখানে মস্ত বড় এক রূপোর থালায় ধান-দূর্বা আর ফুলচন্দন। মেঝেতে কাশ্মীরি কার্পেট। ভদ্রলোক আমাকে সস্নেহে সেই তক্তাপোষের উপর নিয়ে বসালেন, বল্লেন, 'অশোকের মা নেই তা তো জান—তিনি থাকলে ব্যবস্থা হ'তো অন্যরকমের—এমনই অদৃষ্ট ক'রে অভাগা এসেছে যে একটা দিদি ছিল সেটাও সইল না কপালে—এই ছ্যাখো তার স্মৃতি বহন ক'রে বেড়াচ্ছি আজো—' মেয়েটিকে তিনি আঙুল তুলে দেখালেন। ঠিক যেন বাণী। অকৃত্রিম মমতায় তাকে কাছে টেনে নিলাম।

'তোমারই সমস্ত, মা—তুমি হবে আমার ঘরের মূর্তিমতী লক্ষ্মী। তোমাকে দেখার আগে তোমার কথা শুনেই আমি ভেবেছিলাম এ-কথা—দেখে মনে হচ্ছে তুমি তার চেয়ে অনেক বেশি।'

এতখানি স্নেহভাষণের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না—আমার আশা অতদূর যায়নি—সহসা চোখ ভ'রে জল এলো আমার। মায়ের মৃত্যুর পরে বোধ হয় এই প্রথম চোখে

জল। স্পষ্টই মনে হ'লো এত সুখ আমার জন্যে নয়—সুখী হবার জন্ম আমি জন্মাইনি। দাউ-দাউ ক'রে উঠলো মনের মধ্যে। অবশেষে এতদিনকার দুঃখের পাষাণ গ'লে-গ'লে চোখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগলো। অশোক অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে, আর ওর বাবা হাত বুলুতে লাগলেন মাথায়। একটু শান্ত হ'লে উনি আমাকে একজোড়া জড়োয়া কঙ্কণ—আর এক ছড়া সোনার হার দিয়ে আশীর্বাদ করলেন এবং একখানা মোহর দিলেন হাতে।

ফেরবার পথে অশোক বল্ল, 'তুমি অত কাঁদলে কেন?'

'কাঁদবো না? তোমার বাবা আমাকে অত আদর করলেন কেন? আদর কি এর আগে কখনো আমি পেয়েছি, সংসারে কি আমার জন্যেও আদর আছে?'

'পাগলি।' অশোক ঝুঁকে পড়লো আমার মুখের উপর—এই প্রথম ও এই শেষ—ও আমার সঙ্গে একটু অসংযত ব্যবহার করলো, এবং আমিও প্রশ্রয় দিলাম।

হস্টেলের দরজায় নেমে প্রথমেই সেই কঙ্কণ আর হার ছড়া খুলে ভিতরে এলাম—কেউ জানতে পারলো না। কিন্তু আগুন কি ছাইচাপা থাকে? সেদিনই সন্ধ্যাবেলা আমাদের

হস্টেল-সুপারিণ্টেডেন্ট আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে বল্লেন, 'বকুল, এ-সব কী শুনি?'

'কী শোনেন?'

'তুমি নাকি একজন যুবকের সঙ্গে প্রণয় করেছো? এ-রকম অপরিণামদর্শী হলে তার জন্য যথেষ্ট দুঃখভোগ করতে হয় শেষে তা জানো?'

আমাদের হস্টেলের এই কর্ত্রীঠাকুরানীর এ-সব বিষয়ে অসাধারণ ঈর্ষার খবর হস্টেলবাসিনী আমরা প্রত্যেক মেয়েই জানতাম। তিনি দেখতে অসাধারণ খারাপ—যৌবনে নাকি এত বেশি খারাপ ছিলেন যে তাঁর দিকে তাকিয়ে কথা বলতেই ভয় করতো। হৃদয়ের দিক থেকে তিনি তো আর পাঁচজন মানুষের মতই, কাজেই শারীরিক রূপের জন্য পৃথিবী যে-বঞ্চনা তাঁকে করেছিল আসলে তারই একটা প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তাঁর মনে। অন্যের প্রেম ইনি সইতে পারতেন না। যাকে চেনেন না, তারও যদি বিবাহের খবর পেতেন রাগে সর্বশরীর কাঁপিয়ে দাঁত বার ক'রে আমাদের ভয় দেখিয়ে আধ-মরা ক'রে রাখতেন।

সভয়ে বল্লাম, 'আমি বিয়ে করছি।'

'বিয়ে!' বোমা এবার ফাটলো। 'এ-হস্টেলে ও-সব

চলবে না, এত সব অবিবাহিত মেয়ে আছে, কই, কেউ তো তোমার মত এরকম বিয়ে করতে চাইছে না।'

'আর কাউকে দিয়ে আমার কী হবে? বিয়ে তো করছি আমি। আর তাছাড়া এ-হস্টেলে তো এমন কোনো নিয়ম নেই যে এখানে থাকলে কেউ বিয়ে করতে পারবে না।'

'যাও, যাও, জ্যাঠামি কোরো না।' একটু পরে—'বকুল, তুমি ভেবে ছাখো, কাজটা কিন্তু ভালো করছ না।'

'আমার ভাবনার জন্য আপনার উপদেশের প্রয়োজন নেই।'

এর পর সুর বদলিয়ে কর্ত্রীঠাকরুন বল্লেন, 'বকুল, তোমাকে কি আমি ভালোবাসি না? আমি কি তোমার চেয়ে ঢের বেশি অভিজ্ঞ না?—আমার কথা শোনো, বিয়ে তুমি কোরো না। পুরুষরা ভারি অমিতচারী জীব। আজকে তোমার চেহারা সুন্দর আছে, তাই—'এবার আসল কথায় উনি এলেন, 'ধরো কাল তোমার বসন্ত হ'লো, তারপর তোমার মুখ বীভৎস দাগে ছেয়ে গেলো—চুল উঠে টাক প'ড়ে গেলো—তখন তোমার উপায়?' ভদ্র-মহিলার কথা শুনে বুক কেঁপে উঠলো, বললাম, 'ও-সব বলছেন কেন—আপনার

অসুবিধে ক'রে আমি হস্টেলে থাকবো না—আমি কালই চ'লে যাবো।'

'না, না, চটো কেন—আহা চটো কেন।' উনি দাঁত বের ক'রে হাসতে লাগলেন।

পরের দিন ভোরে উঠেই বেরিয়ে গিয়ে ফোন করলাম অশোককে। দেখা হ'তেই সব বল্লাম। 'তবে উপায়?' অশোকের মুখ শুকিয়ে গেলো। বল্লাম, 'ভয় পাচ্ছ কেন? আমি আপাতত আমার কাকার বাড়িতে গিয়ে উঠি। এর মধ্যে তুমি আমার জন্যে একটা বাড়ির খোঁজ করো এক মাসের জন্যে—আজকে ছাখো উনত্রিশ তারিখ, আর ক'টা দিন বা আছে, কেটে যাবে।'

'কোন পাড়ায় বাড়ি নেবে?'

'হস্টেলের কাছেই নেয়া ভালো—কেননা আমার তো বন্ধু-বান্ধবরাই সব—ওদের যেখানে সুবিধে সেখানে থাকাই ভালো।' ফিরে এসে রাণী-বাণীকে জিনিসপত্র গোছাতে ব'লে যারা বিশেষ বন্ধু তাদের ডেকে বল্লাম সমস্ত কথা—মুহূর্তে হস্টেলটি সরগরম হ'য়ে উঠলো—কেউ উলু দিতে লাগলো, কেউ গান ধরলো, কেউ বা তবলা বাজায়—বেলা বারোটার সময় এমন মারাত্মক গণ্ডগোল আরম্ভ হ'লো যে চেয়ে দেখি

আশে-পাশের বাড়ির জানালায় সব জোড়া-জোড়া চোখ। উত্তেজনা থামলে বল্লাম, 'ছাখ, তোদের মেকুরঠাকরুন তো আমাকে হস্টেলে থাকতে দেবেন না।'

আমাদের হস্টেল সুপারিনটেনডেন্টের একটি বদ অভ্যাস ছিল, কয়েকজন মেয়েকে একসঙ্গে জটলা করতে দেখলেই উনি পা টিপে-টিপে এসে পিছনে দাঁড়াতেন—তাঁর ধারণা মেয়েরা একসঙ্গে হ'লে নিশ্চয়ই প্রেমের গল্প করে।—পুষ্প আমার সহপাঠিনীও ছিল এবং সবচেয়ে অন্তরঙ্গও ছিল—ঢাকার মেয়ে সে—ঢাকার প্রাদেশিক ভাষায় বেড়ালকে 'মেকুর' বলে—এ নামকরণ পুষ্পরই কীর্তি। ও অবিশ্যি 'মেকুর ঠাকরুন' বলতো না, বেশির ভাগই বলতো 'মেকুরনিটা' —কখনো-কখনো রাগ কম থাকলে 'মেকুরঠাইন'। কী ভীষণ হাসাহাসি হ'তো আমাদের মধ্যে এ নামকরণ নিয়ে—সে-কথা ভাবলে এখন অবাক লাগে। ওঁর আসল নাম সুললিতা ব্যানার্জি। এই সুললিতা নামটির জন্যও বেচারা অসম্ভব লাঞ্ছিত হ'তেন। আমাদের শান্তিদি—তিনি আবার একটি পদ্যও লিখেছিলেন এই নিয়ে—

শোনো মিস্ ব্যানার্জি
মা-বাপের মরজি

তাই করি সহ্যি
তোমার ও-নাম।
হ'তো যদি হিড়িম্বা,
হস্তিনী, কিম্বা
জয়জগদম্বা,
মিলতো স্বনাম!

ওঁর বাথরুমের দেয়ালে অতি সুরূপা একটি নারী-মূর্তি এঁকে তার পাশে এই পদ্যটি লেখা হয়েছিল।

পুষ্প বল্ল, 'কেন, হস্টেল কি মেকুরনির সম্পত্তি নাকি? কিছুতে তুই যাবিনে বকু—দিক্ তো তোকে তাড়িয়ে, দেখি কত বড় বুকের পাটা।—কিন্তু ভাই বকু—' আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে ও রঙ্গ ক'রে বল্ল, 'তুই তো দিব্যি টোপ গেলালি —আর এ-অভাগিনীগুলোকে কি ভাসিয়ে দিবি?'

'তুমি বাবা গভীর জলের মাছ—আর আমরা চুনোপুঁটিরা —হায় হায়রে—' ব'লে অণিমা ঠাস্‌ঠাস্ কপাল চাপড়াতে লাগলো। শান্তিদি গানে মত্ত ছিলেন, কান এগিয়ে দিয়ে বল্লেন, 'এই কী বল্‌লি তোরা?'

আমি বল্লাম, 'শান্তিদি, কাজের কথা শোনো। মেকুরনির সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এখানে থাকা আমার ভালো মনে হয় না—

আজ আমি আমার কাকার বাড়ি চ'লে যাই, কাল ভোরে তুমি আর পুষ্প হস্টেলে অপেক্ষা কোরো, তিনজনে মিলে একটা বাড়ি খুঁজে বার করবো।' পুষ্প খুনোখুনি করতে লাগলো, 'ক্ষেপেছিস্ নাকি?—অত মিনিমুখো হ'য়ে অন্যায় সহ্য ক'রে তুই চ'লে যাবি? না—তা হবে না।' অনেক ব'লে-ক'য়ে ওকে শান্ত করলাম আর তার ঘণ্টা কয়েক পরে আমার শান্তির আবাস চিরতরে ভেঙে ফেলে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়।

তিন বছর পরে আবার দেখা কাকার সঙ্গে। বাইরের ঘরেই বসেছিলেন, ট্যাক্সি থামতেই হুঁকো হাতে এগিয়ে এলেন, 'এ কী, তোরা যে।'—হাসি মুখে বল্লাম, 'এলাম'।—ব'লেই ব্যাগ থেকে দু'খানা দশ টাকার নোট বার ক'রে কাকার হাতে দিয়ে বল্লাম, 'ট্যাক্সি ভাড়াটা চুকিয়ে, টাকাটা আপনার কাছেই রেখে দেবেন।'

কাকা ইঙ্গিত বুঝে খুশি হ'য়ে অভ্যর্থনা করলেন, 'যা, যা, ভিতরে যা, এতদিনে মনে পড়লো।'

তারপরের কয়েকটা দিন অবর্ণনীয়। সমস্ত দিন ঘোরা-ঘুরি—জিনিষপত্র কেনা—বাড়িঘর ঠিক করা—টাকাটাও আমার, পরিশ্রমটাও আমার তবু কাকাকে শিখণ্ডীরূপে দাঁড়

করিয়ে রাখতে হ'লো। আমার নতুন বাড়ি ঝম্‌ঝম্‌ করতে লাগলো আর এতদিনের সমস্ত সঞ্চয় আমি দু'হাতে উড়িয়ে দিলাম মনের আনন্দে।

বিবাহের তিনদিন আগে অশোক বল্ল, 'চলো তোমাকে নিয়ে আংটি কিনতে যাবো।' বেরুলাম দু'জনে, এখানে ওখানে ঘুরে কেনা হল আংটি—গাড়িতে ব'সে ও আমার আঙুলে পরিয়ে দিল। হেসে বল্লাম, 'হীরের আংটি দিয়ে ভালোই করলে, প্রয়োজন হলে আত্মহত্যা করা সহজ হবে।' ফেরবার পথে হস্টেলে নামলাম। যেতেই শান্তিদি বল্লেন, 'আজ দু'দিন ধ'রে মাধবীর বাড়ি থেকে তোকে এমন জরুরি ডেকে পাঠাচ্ছে কেন রে?'

'মাধবীরা এসেছে?'

'নিশ্চয়ই, নয়তো ডেকে পাঠাবে কেন?'

'তবে তো আজই যাওয়া উচিত আমার।'

পুষ্প বল্ল, 'আরে বোস্‌ বোস্‌—'

'না ভাই, মরবার সময় নেই আমার।'

গেলাম মাধবীদের বাড়ি। বসবার ঘর পার হ'য়ে খাবার ঘরে ঢুকতেই মাধবীর সঙ্গে চোখাচোখি।

'কোথায় গিয়েছিলি তোরা?' উৎসাহভরে কাঁধে হাত

দিলাম—মাধবী নিঃস্পন্দ। 'কী হয়েছে তোর?' ব'লেই মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ওকে আর মাধবী ব'লে চেনা যায় না। অমন সুন্দর লাবণ্যভরা মুখময় কে যেন দোয়াতের কালি ঢেলে দিয়েছে। একখানা রঙিন খদ্দরের চাদরে সমস্ত দেহ আবৃত ক'রে অতিশয় নিচু সুরে বল্ল, 'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে, আমার ঘরে এসো।'

ঘরে গিয়ে বসতেই বল্ল, 'তোমার নাকি বিয়ে?'

'হ্যাঁ'

'কার সঙ্গে?'

'তুমি কি কিছুই জানো না?'

'জানি না ঠিক, তবে জনরব কানে এসেছে। সত্যিই কি অশোক?'

'হ্যাঁ।'

'অশোক তোমাকে বিয়ে করছে?'

'আপাতত তো তাই ঠিক।'

'অশোক কি কখনো বিয়ে পর্যন্ত এগোয়?'

আমি অসহিষ্ণু হয়ে বল্লাম, 'এ-সব ব'লে এখন লাভ কী, মাধবী, যা হচ্ছে তা আর ফিরবে না।'

আমার কথায় একটু ঝাঁঝ ছিল। কেননা অশোক

বলেছিলো মাধবী আশা করেছিল ওকে—বুঝলাম সেই ঈর্ষায় মাধবী আজ এত বিচলিত।

'আলবৎ ফিরবে।' আমি হঠাৎ চম্‌কে উঠলাম ওর গলার জোরে।

'তুমি কি পাগল হ'লে, মাধবী? এমন করছো কেন?'

'এমন করছি কেন'—মাধবী উত্তাল হ'য়ে কাঁদতে-কাঁদতে বল্ল, 'আমি ওকে ভালোবাসি, বকুল—বকুল, ওকে তুই ছেড়ে দে। বকুল, তোর কাছে আমি আজন্ম কেনা রইবো—তু ওকে ছেড়ে দে।—তুই ওকে ছেড়ে দে।'

আমি কী বল্‌বো ভেবে পেলাম না—উঠে প'ড়ে বল্লাম, 'মাধবী, আমি আজ যাই।'

হঠাৎ মাধবী দুই হাতে আমার পা জড়িয়ে ধরলো, 'বকুল, তুই কথা দিয়ে যা এ-বিয়ে তুই ভেঙে দিবি।'

'মাধবী, তা আর হয় না, তুমি ভালোবাস একা, আমাদের ভালোবাসা পরস্পরের। তা ছাড়া তোমার সুখী হ'তে ইচ্ছে করে, আমার করে না? কী পেয়েছি এ-জীবনে—অনাথ ব'লে তুমিও অবহেলা করেছো, আমি ছাড়বো না—কক্ষনো ছাড়বো না—ওঠো তুমি পা ছেড়ে।' ছিনিয়ে আনলাম পা মাধবী চোখ মুছে মুখোমুখি দাঁড়ালো। 'বকুল, সব সত্যি—

কিন্তু আমাকেও তো পথ ব'লে দেবেন তোর স্বামী। তাঁর সন্তান যে আমি এই চারমাস ধ'রে এত কষ্টে এত দুঃখে লালন করছি তার কী উপায় হবে?'

'তাঁর সন্তান!' বজ্রাহতের মতো আমি ব'সে পড়লাম মাটিতে।

'হ্যাঁ, তাঁর সন্তান।

'অশোকের সন্তান?'

'হ্যাঁ, অশোকের সন্তান। শুধু আমাকে নয়, বকুল, ফাঁদে ফেলে সে অনেককেই এই উপহার হয়তো দিয়েছে, তার ভালোবাসার ভাণ আমরা বুঝিনি।'

'এত বড় লম্পট অশোক! এত বড় লম্পট!'

ঘৃণায় দুঃখে অভিমানে অপমানে জর্জরিত হ'য়ে ফিরে এলাম বাড়িতে। সমস্ত রাত্রি জেগে চিঠি লিখলাম দু'খানা। একখানা অশোককে, একখানা মাধবীকে। পরের দিন ভোর হ'তেই তা ডাকে ফেলে বেরিয়ে গেলাম বাড়ি থেকে। ট্র্যামে বাসে রিক্‌শাতে সমস্তটা দিন কী ক'রে যে কাটালাম জানি না। এ লজ্জা আমি রাখবো কোথায়? কী কৈফিয়ৎ দেবো সকলকে? বাড়ি ফিরলাম চারটাতে। ফিরেই শুনলাম অশোক প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ব'সে আছে আমার জন্যে। কী

করি—ইচ্ছে ছিল না দেখা করবার, কিন্তু ছোট বোনদের সামনে 'সীন্' করতে পারলাম না।

আমি যেতেই অশোক মাথা নিচু করলো। বললাম, 'আমার চিঠি পাননি?'

'পেয়েছি।'

'তবে এসেছেন যে?'

'পাপ করেছি আমি, কিন্তু তার প্রায়শ্চিত্ত কি তুমিও করবে?'

'আমি করবো কেন?'

'আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ না-হওয়া মানেই তোমারও প্রায়শ্চিত্ত। বকুল, মাথা ঠাণ্ডা করো—আমাকে ক্ষমা করো।'

'অশোকবাবু!'—আমার ডাক শুনে অশোক কেঁপে উঠলো। 'যা বলছি শুনুন—আপনি আর আমার বাড়িতে আসবেন না।'

'এই কি শেষ কথা?'

'হ্যাঁ, এই আমার শেষ কথা।'

অশোক বেরিয়ে গেলো বিবর্ণ মুখে।

মাধবীকে বিয়ে করতে ও বাধ্য হয়েছিলো শেষ পর্যন্ত।

আমি সেই সময়ে ময়মনসিংহে কাজ জোগাড় ক'রে চ'লে গেছিলাম।

অশোকের বাবার দেওয়া সেই জড়োয়ার কঙ্কণ আর হার আমি আশীর্বাদ পাঠিয়েছিলাম মাধবীকে। হীরের আংটিটি পারিনি খুলতে। কত রাত্রে, কত দিনে, কত নিরালা অবকাশে এই আংটিটা আমাকে দুঃখ দিয়েছে, তবু খুলিনি। মৃতমানুষের চিহ্ন যেমন তার সন্তান—এই আংটিটাও আমার কাছে তেমনি ছিল, আজকে দিয়ে এলাম অশোকের সন্তানকে সেটা। সেই থেকে এই তো দশ বছর কাটলো। মাষ্টারি ক'রে-ক'রে হাড় পাকা হ'য়ে গেলো। এমনকি আমাকে দেখলে পর্যন্ত লোকেরা জিজ্ঞেস করে, 'আপনি বুঝি মাষ্টারি করেন?' তবু কেন পোড়া জায়গায় চাপ দিলেই ঘা বেরিয়ে আসে?

কিন্তু অশোক কেমন আছে এখন? কে ওর সেবা করে?…কী নিষ্ঠুর মাধবী!

ভাবছি কাল একবার অশোককে দেখতে যাবো।

অনর্থক

আমি একথা কখনোই বুঝিনি যে সমীর আমাকে ভালোবাসে। বাপ ওর সবজজি ক'রে চুল পাকিয়েছেন, এসব বিষয়ে তাঁর শ্যেন-দৃষ্টি। মাঝে-মাঝে এ-বাড়ি আসবার অপরাধে ছেলেকে লাঞ্ছিত করতেন শুনেছি। আমার বাবা মহাদেব— তাঁর মনে দুর্বুদ্ধি নেই, একথা তাই মনে করেননি যে সমীরের সঙ্গে মেশামেশির ফলে কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। চরিত্র খারাপ হবার ভয়ে তিনি আমাকে চেপেও রাখেননি। অতিশয় সহজে মনের আনন্দে আমি স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করেছি, বন্ধুতা পাতিয়েছি এবং ছেলেবেলা থেকে মেলামেশায় বাধা না-পেয়ে স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধে সচেতনও হইনি।

সমীরকে ভালো লাগতো, সমীর এলে খুশি হতাম এবং যতক্ষণ সমীর থাকতো সময়টা কাটতো ভালো। ওর বিলেত-ফেরত দাদার কাছে ও নানারকম খেলা শিখেছিলো, সে-সব খেলা আমাকে শেখাতো, আমি পাড়া থেকে ছেলে-মেয়ে সংগ্রহ ক'রে খেলার সঙ্গী করতাম। সবাই বলতো সমীর

দেখতে সুন্দর, আমি বলতাম না। ও ফর্সা ছিল বটে, কিন্তু পুরুষমানুষ অত ফর্সা আমি পছন্দ করতাম না। ওর চোখ বড় বড় ছিল, কিন্তু আমি তাতে বুদ্ধির দীপ্তি দেখিনি। ওর হাত ছিল গোল গোল নরম আর ধব্‌ধবে ফর্সা। পুরুষমানুষের ঐ ননীর শরীর দেখলেই আমার মোটাবুদ্ধি রাখু গয়লাকে মনে পড়তো। এ-কথা ব'লে আমি সমীরকে ঠাট্টা ক'রে রাখতাম না। সমীর ম্লানমুখে বলতো, 'আমার কিছুই কি তোমার ভালো লাগে না? আমার রং ফর্সা তার আমি কী করতে পারি, আমার হাত গোল তাতেই বা আমার কি হাত আছে, আমার চোখের দৃষ্টিতে বুদ্ধি খেলে না সেও বিধাতার অভিশাপ।' আমি ওর হাতের উপর হাত রেখে বলতাম, 'রাগ করলে?' তক্ষুনি লক্ষ্য করেছি ওর চোখে আলো জ্ব'লে উঠেছে—হাসিতে ভ'রে উঠেছে মুখখানা।

আমার বয়স যখন চোদ্দ তখনই আমার সমীরের সঙ্গে প্রথম দেখা। ও তখন সবে আই-এ পড়ছে। চোদ্দ বছরের মেয়ের মধ্যেই সাধারণত জোয়ার আসে, আমার এসেছিলো দেরিতে। অর্থাৎ ষোলো বছর বয়সে আমি প্রথম উন্মনা হ'তে শিখলাম। ফাল্গুন মাসে আমার জন্ম, আমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে সেবার যারা এলো তারা সবাই বললে

আমার আর আগের মত উদ্দাম আনন্দ নেই। ওরা বুঝলো না আমার মনে এখন উদ্দাম বসন্ত নেমেছে। আর দেরিতে নেমেছিলো ব'লে তার গভীরতা হয়তো একটু বেশি হয়েছিলো। সেদিন আমি একজনকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। সে যখন আমার কাছে পান চেয়েছিলো তার চোখের দিকে চেয়ে বুক কেঁপে উঠেছিলো। সমীর সেখানে ছিলো—কী ভেবেছিলো জানি না, হঠাৎ উঠে বাড়ি চ'লে গেলো।

পরের দিন বিকেলে এলো না, তারপরের দিনও এলো না। আমার বাবার এক বন্ধু থাকেন ওদের পাড়ায়, বাবার সঙ্গে তাঁদের বাড়ি গিয়েছিলাম সেখান থেকে সমীরের খোঁজেও গেলাম তাদের বাড়ি। ওর সঙ্গে আমাদের পরিচয় আত্মীয়তার ছেঁড়ালতায়। আর পরিচয়ের পর থেকে এমন দিন যায়নি যেদিন বিকেলে সমীরকে আমাদের বাড়ি-ছাড়া কেউ দেখেছে। পারলে সে সমস্ত দিন থাকে, কিন্তু প্রশ্রয়ের অভাবে সে-ইচ্ছা ও চেপে রাখতো অতি কষ্টে। গিয়ে দেখলাম বাড়িতে কেউ নেই, অন্ধকার ঘরে সমীর কপালে হাত রেখে ডেক্-চেয়ারে শুয়ে আছে। আমাকে দেখে লাফিয়ে উঠলো। তখন বুঝিনি, কিন্তু এখন বুঝছি ওর বুক তখন ধ্বক্‌ধ্বক্ ক'রে কাঁপছিলো, হয়তো আমার কান থাকলে

সে-স্পন্দন শোনা কিছুই কষ্ট হ'তো না। 'এ কী, তুমি এসেছো ?' মুখে ওর রক্ত উঠে এসেছিলো বোধ হয়। দৌড়ে গিয়ে সুইচ্‌ টিপলো। আমি বললাম, 'তুমি যে যাও না ?'

'এমনি।'

'এমনি মানে ?'—আমি একটু রাগ ক'রে বললাম।

সমীর কোনো জবাব দিলো না।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'পিসিমা কোথায় ?'

'বিয়ের নেমন্তন্নে গেছেন।'

'তুমি গেলে না যে ?'

'বিয়েতে যেতে আমার ভালো লাগে না।'

তারপর একটু ইতস্তত ক'রে বললে, 'অশোকের সঙ্গে তোমার কতদিনের আলাপ ?'

'ও, অশোক ?' আমি উৎসাহের সঙ্গে বললাম, 'ও তো ছোটমামার বন্ধু, আমার সঙ্গে ঐ সেদিনই দেখা। ভারি চমৎকার কিন্তু।'

বিদ্রূপের স্বরে সমীর মুখে-মুখে ব'লে উঠলো, 'তাই নাকি ?'

ওর বিদ্রূপ বুঝতে পেরে একটু যেন বিরক্ত বোধ করলাম। অশোকের মুখ তখনো স্পষ্ট আমার মনে দাগ

কেটে আছে। প্রথম দেখেছি, তাও হয়তো বড় জোর আধ ঘণ্টার দেখা। অথচ এ দু'দিন ক্রমাগতই ওর প্রসঙ্গ উঠলে আমি যেন উত্তাল হ'য়ে উঠতাম। সমীরের কথার জবাব না দিয়ে চুপ ক'রে রইলাম।

'রাগ করলে নাকি ?'—সমীর কোমল গলায় বললে।

'রাগ করবো কেন ?'

'কথা বলছো না যে ?'

'এবার যাই—আর কি।'

'না, না, বোসো বোসো'—তারপর হঠাৎ একান্ত কাছে এসে বসলো—বললে, 'মণি, আমি বি. এ. পাশ ক'রে কলকাতা চ'লে যাবো।'

'বেশ তো, বেড়িয়ে আসবে।'

'না ভাই, বেড়াতে না—পড়তে।'

'কেন ?'

'ভালো লাগছে না এখানে। পরীক্ষার আমার দেরি নেই বেশি—অথচ একটুও পড়ায় মন দিতে পারছিনে।'

ঠাট্টা ক'রে বল্লাম, 'প্রেমে পড়েছো নাকি ?'

'হ্যাঁ।'

সমীর যে হ্যাঁ কথাটা উচ্চারণ করলো তার মধ্যে এতটুকু

হাল্‌কা সুর ছিলো না। কথাটা যেন সত্যি ক'রেই বললো। আমি জানতাম সমীরের বাবা যখন খুলনা ছিলেন তখন ছোট্ট একটি মেয়েকে তাঁরা বৌ করবেন এরকম জল্পনা-কল্পনা করতেন। সেখানকারই এক মুন্সেফের মেয়ে। হঠাৎ পাঁচ বছর পরে সেই মুন্সেফ যখন পেন্সন নিয়ে এসে ঢাকা বাড়ি ক'রে বসলেন তখন সমীরের মা কথাটা প্রায় পাকা ক'রে ফেলবার চেষ্টা করলেন। মেয়েটি তেরো বছরের। সমীরের মা বলেছিলেন কথা এখন ঠিক ক'রে রাখবো তারপর ছেলে এম্. এ. পাশ করলে বিয়ে দিয়ে বিলেত পাঠাবো। বিলেতের খরচাটি অবিশ্যি মুন্সেফবাবুই দেবেন।

সমীর একটু পরে আবার বললো, 'আচ্ছা মণি, অশোককে তোমার কেমন লাগলো? ব্রিলিয়েন্ট ছেলে শুনেছি, কিন্তু দুর্নাম অনেক।'

ঠোঁট উল্‌টিয়ে বল্‌লাম, 'ভারি দুর্নাম, কেউ একটু মাথা তুললেই লোকেরা অমন বলতে থাকে—আমি ওসব মানি না।'

সমীর সে-কথার জবাব দিলো না, একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'আমি কলকাতা যাবার আগে তোমাদের বাড়ি আর যাবো না ভেবেছি।'

'ভালোই তো ভেবেছো।' আমি রাগ ক'রে মুখ ঘোরালাম।

সমীর মৃদুস্বরে বললে, 'তুমি তো তা হ'লে খুশিই হও।'

'তুমি তো দেখছি অন্তর্যামী।'

'আর কারো না হই, তোমার অন্তর্যামী অন্তত।'

'তবে যেয়ো না।' আমি রাগ ক'রে উঠে দাঁড়ালাম।

'পাগল নাকি'—সমীর আমার হাত টেনে বসালো। শুনতে পেলাম বাবার পায়ের শব্দ। জুতোর শব্দ করতে-করতে উনি উঠে এসে বললেন, 'মণি—যাবি না?' সমীরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার মা কোথায়?' 'বিয়ে বাড়ি গেছেন, বসুন না একটু।" সমীর কাকুতি করতে লাগলো আর-একটু বসবার জন্যে, কিন্তু বাবা আর বসলেন না। চ'লে এলাম।

তারপরে ওর সঙ্গে আমার একমাস মাত্র আর ভালো ক'রে দেখাশোনা হয়েছিলো। সত্যি-সত্যিই ও বি. এ. পরীক্ষা হবার পর কলকাতা চ'লে এলো পড়তে। আমার ভারি কষ্ট হয়েছিল ও চ'লে আসবার দিন। আগের দিন সন্ধ্যাবেলা যখন বললো, 'কাল থেকে তোমাকে দেখবো না ভাবতে বড় কষ্ট হয়,' আমার কান্না পেয়েছিলো, ভাঙা গলায়

বলেছিলাম, 'তুমি যাচ্ছো নতুন জায়গায়—আমি তো এখানেই থাকলাম—আমারই অভাবটা লাগবে বেশি।'

'তোমার কষ্ট হবে? আমার কথা তুমি ভাববে এরকম সময়?' কথাটার যেন জবাব শুনবে ব'লে উৎসুক হ'য়ে ও তাকিয়ে রইলো আমার মুখের দিকে। আমি চুপ ক'রে রইলাম।

তারপরে দেখা আমাদের পুরো এক বছর পরে। ওর বাবা মাও কলকাতা গিয়ে ছিলেন কিছু দিন। ছেলেকে লায়েক ক'রে দিয়ে শেষে হস্টেলে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে এলেন এতদিনে। সমীরকে দেখে আমার লজ্জা করলো যেন। চমৎকার বাবু হয়েছে দেখলাম। চেহারাও বদ্‌লেছে কিছু। কথাবার্তায় দিব্যি সপ্রতিভ। আমাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে বললো, 'বাঃ, এতদিন পরে এলাম, প্রণাম করলে না?'

'ঈস্!'

'ঈস্ কী—আমি তো তোমার বড়'—ব'লেই আমার কাপড়ের আঁচল টেনে বসিয়ে দিলো। বললাম, 'কেমন আছো?'

'দেখ্‌ছোই তো—তুমি কেমন আছো?'

'ভালোই।'

'আমার চিঠির জবাব দাওনি যে ?'

'কী তার জবাব দেবো।'

'তা দেবে কেন—আমাকে মনেই থাকতো ভারি।'

'চিঠিটাই নাকি মনে রাখার নিদর্শন !'

'নিশ্চয়ই।'

'তবে এবার থেকে দেবো।'

তারপর এ-কথা সে-কথার পরে হঠাৎ বললো, 'তোমার অশোক রায়ের খবর কী ?'

বললাম, 'আমি কী জানি !' সত্যিই আমি জানতাম না। সেই যে একদিন এসেছিলো—তারপর বড় জোর আর দু'দিন এসেছিলো কিনা সন্দেহ।

হেসে টিপ্পনি কেটে বললো, 'তোমার বন্ধুর খবর তুমি রাখো না, ভারি আশ্চর্য তো।'

টিপ্পনিটুকু আমার কোথায় যেন বাজলো। বললাম, 'বন্ধু হ'লে খুশি হতাম, কিন্তু বন্ধু না-হ'য়েও একথা সবাই জানে যে অশোক রায় এবার এম্. এ.-তে ফার্স্ট হয়েছে।'

সমীর গম্ভীর হ'য়ে রইলো।

গ্রীষ্মের আড়াই মাস ছুটির মধ্যে দেড় মাসই প্রায় কলকাতায় কাবার ক'রে এসেছিলো। দিনকুড়ি থেকে আবার

চ'লে গেলো। প্রথম-প্রথম গিয়ে আমাকে চিঠি লিখতো কিন্তু ওর মাথায় কী যে এক অশোকের চিন্তা ঢুকেছিলো—সব চিঠিতেই একটা রূঢ় মন্তব্য না-ক'রে পারতো না। ফলে আমি জবাব দিতাম না, কাজে-কাজেই সম্পর্কটা শিথিল হ'য়ে এলো। তাছাড়া একবার লিখলো মুন্সেফের মেয়েটিকে বিবাহ করার জন্য পিড়াপিড়ি করায় মার সঙ্গে ও ঝগড়া করেছে। আমি অবাক হ'লাম, কিন্তু সত্যি-সত্যি তার পরে যে ও এলো সে একেবারে এম.-এ. পরীক্ষা শেষ ক'রে। বললো, বিলেত যাচ্ছে একমাসের মধ্যে। যাবার দিন আমাকে একটা ফাউন্টেন্ পেন্ উপহার দিয়ে বলেছিলো, 'চিঠি লিখো।' আমি সেদিন কেঁদেছিলাম। সমীরের জন্য নয়—একজন মানুষ অত দূরে চ'লে যাচ্ছে ভেবে। সমীর কী বুঝলো জানি না—আমার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললো, 'তিনটি বছর আরো, আরো তিনটি বছর। আমি এখনো সম্পূর্ণ মা-বাপের হাতের মুঠোয়; আমি এখনো নাবালক।' কথাটা বলতে-বলতে ও উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো। হঠাৎ পলকে যেন আমি ওর মনের কথাগুলো বুঝতে পেরে লাল হ'য়ে উঠলাম, কিন্তু কয়েকদিন পরেই তা আর মনে রইলো না।

এক বিকেলে বকশিবাজার থেকে ফিরছিলাম ঘোড়ার

গাড়িতে। প্রত্যেক রবিবার আমার এক বন্ধুর বাড়ি আমার নিমন্ত্রণ থাকতো। বন্ধুটি আমার চেয়ে কম ক'রেও দশ বছরের বড়। নতুন ফিরেছেন বিলেত থেকে—তারপর কাজ নিয়ে এসেছেন মেয়েদের কলেজে। আমার সঙ্গে দেখা হবার কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা বয়সের অত ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও পরস্পরের বন্ধু হলাম। মাধুরীদি যে আমাকে কেবলমাত্র স্নেহ করতেন তা নয়, কেমন একটা বন্ধুতা হয়েছিলো যার জন্য দু'জনে সমস্ত দিন একসঙ্গে কাটিয়েও আমরা বিরক্ত বোধ করতাম না। স্নেহাস্পদের সঙ্গে মানুষ কখনোই সমস্ত দিন হাসি-গল্প ক'রে কাটাতে পারে না—কিন্তু আমরা এক খাটে শুয়ে সমস্তটি দুপুর যে-রকম উচ্চস্বরে হেসেছি আর কথা বলেছি তাতে কেউ একথা মনে করতে পারেনি যে আমি মাধুরীদির অত ছোট, এবং সমস্ত দিক দিয়েই ছোট।

বৃষ্টি পড়ছিলো সেদিন। সমস্ত দিন পরে বিকেল প্রায় পাঁচটার সময় একটু যেন থামলো। আমি মাধুরীদির চাপরাশি নিয়ে গাড়ি ক'রে ফিরছিলাম, কিন্তু একটু পরেই বৃষ্টি আবার ঘন হ'য়ে নামলো। ত্রস্তে জানালাটা টেনে দিতে গিয়েই পথে দেখলাম অশোক। কোঁচা লুটিয়ে সে ভিজতে-ভিজতে চলেছে, হাতে ছাতা নেই। আদ্দির পাঞ্জাবি ভিজে

ভিতরের শরীরটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। আমি নিমেষে গাড়ি থামাবার আদেশ করলাম, তারপর মুখ বাড়িয়ে ইশারায় তাকে ডাকলাম। গাড়ির দরজাটা ধ'রে মৃদু হেসে নমস্কার করলো। চেয়ে দেখলাম তার হাসির তুলনা নেই, তার চোখের তুলনা নেই। কুণ্ঠিতভাবে বললাম; 'গাড়িতে আসুন' —কথা কয়টার সুরে আমার মনের সমস্ত ইচ্ছা হয়তো জড়ানো ছিল। সে আপত্তি করলো না—অত্যন্ত সহজে গাড়ির মধ্যে ঢুকে বললো, 'বাঁচালেন।' তারপর সমস্তটা পথ প্রায় চুপ ক'রেই কাটলো। অশোকদের বাড়ি পথে পড়ে না, আমি গাড়োয়ানকে ডেকে ওদের বাড়ির দিকে যাবার কথা বলতে যাচ্ছিলাম। অশোক বাধা দিয়ে বল্‌ল, 'ক্ষেপেছেন— আপনি একজন মহিলা, আপনাকে ফেলে আমি আগে নেমে যাবো? আপনাকেই আগে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি চলুন।'

হেসে ফেললাম—'বাঃ, আমি তো একাই যাচ্ছিলাম।'

'তা যাচ্ছিলেন—কিন্তু সঙ্গী যখন জুটলো তাকে এই সম্মানটুকু অন্তত দিন।'

কী বলবো, চুপ ক'রে রইলাম।

বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে সে সেই গাড়িতেই চ'লে গেলো। অনেক বলেছিলাম কিন্তু নামলো না, গাড়ি-ভাড়াও দিতে

দিলে না। পরের দিন বিকেলের ডাকে ধন্যবাদ বহন ক'রে শুধু এইটুকু একলাইন চিঠি এলো।

জবাব দেবার কিছু নেই, তবু সমস্তদিন সে-ইচ্ছার তাগিদে আমি উন্মনা হ'য়ে ঘুরে বেড়ালাম। চিঠির লাইন দু'টি একশোবার মনে-মনে আবৃত্তি করলাম, তারপর সন্ধ্যার নির্জন অবকাশে আবছা অন্ধকারে ব'সে-ব'সে দেয়ালের গায়ে ইটের কণা দিয়ে লিখলাম, 'আমি তাকে ভালোবাসি'— কতবার লিখলাম তা জানি না—একবার, দু'বার তিনবার, অসংখ্যবার একটার গায়ের উপর আর একটা লিখে চললাম।

এর ঠিক ছ'মাস পরে আমাদের বিয়ে হয়েছিলো। ছ'মাসের মধ্যে তিনমাস অশোক ঢাকায় ছিল—আর সে তিনমাসেই আমরা পরস্পরকে সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছিলাম, এতটুকু মেকি বা ফাঁকি ছিল না। তিনমাস পরে অশোক কলকাতার এক কলেজে প্রোফেসরি নিয়ে চ'লে এলো— 'ভালো ক'রে ভেবে দেখো এ তিন মাস।'

সুদীর্ঘ তিনমাস পরে বাবাকে বললাম। বাবা একটু অবাক হলেন। এমন কিছু ওঁরা পাননি আমাদের ব্যবহারে যা থেকে একটু আঁচও করতে পারেন। তাছাড়া এ তিনমাসে

অশোক আর আমি চিঠিপত্র লেখালেখিও করিনি। মা বললেন, 'অশোক তো এখানে নেই।' আমি বললাম, 'তাতে কী।'

'তবে কী ক'রে হবে?'

আমি অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে অস্ফুটে বললাম, 'আমি লিখবো।' মা-বাবা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন, আমি কুণ্ঠিতভাবে পাশের ঘরে চ'লে এলাম। কয়েকদিন পরে মার নামে চিঠি এলো অশোকের মার কাছ থেকে।

বিয়ে হবার এক বছর পরে শুনলাম সমীর ফিরে এসেছে। মনটা ব্যগ্র হ'লো দেখবার জন্যে।

অশোককে বললাম, 'সমীর আমার অত্যন্ত বন্ধু ছিলো, কতদিন পরে এলো, দেখতে ইচ্ছে করছে।' অশোক বললো, 'কোথায় আছে জানো?'

'তা তো জানি না।'

'তবে?'

'তাই তো।'

মাকে লিখলাম ঠিকানার জন্যে। মা লিখলেন তিনিও জানেন না। আরো কিছুদিন পরে খবর পেলাম সমীর ভালো কাজ পেয়েছে, আছে কলকাতাতেই। আমার

আগ্রহও ততদিনে নিবে এসেছিল। দেখা হ'লে খুশি হই এ পর্যন্ত।

হঠাৎ সেদিন সমীরের মামাতো ভাই বাবলুর সঙ্গে পথে দেখা। কথায়-কথায় বললে, 'সমীরদার খবর রাখো?' আগ্রহের সঙ্গে বললাম, 'তুমি রাখো নাকি? ঠিকানা জানো?'

'নিশ্চয়ই—আরে সে যে মস্ত সাহেব হ'য়ে ফিরেছে, শুনছি নাকি মেম বিয়ে ক'রে এসেছে। মা-বাপ তো বিয়ে দেবার চেষ্টায় খুন হ'য়ে গেলো।'

'তাই নাকি?'—অবাক হ'য়ে বললাম।

বাবলু একটু ঠাট্টার সুরে বললে, 'কেন, তোমার সঙ্গে এত ভাব, আমরা তো তখন কতই ভেবেছিলাম—তোমার সঙ্গেও দেখা করেনি?'

আমি সে-কথার জবাব না-দিয়ে বললাম, 'আমাকে ওর ঠিকানাটা দিতে পারো?' বাবলু একটা টুকরো কাগজ বার করলো পকেট থেকে—তারপর ঠিকানা লিখে দিল।

কী যে কৌতূহল হ'লো, ঠিকানা নিয়ে এসেই অশোককে বললাম, 'এই চলো না—সমীরকে দেখে আসি।'

'তুমি যাও, আমি তো চিনি না।'

'তাতে কী। আমারই তো বন্ধু। আর এই তো কাছে থাকে।' অশোকের কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যিই যাওয়া হোলো না। অগত্যা আমি একাই গেলাম দেখা করতে।

দোতলার ফ্ল্যাট। বিলিতি ধরনে সাজানো গোছানো। বসবার ঘরে গিয়ে বস্‌তেই 'বয়' এসে অত্যন্ত বিনয় ক'রে বললে, 'মেমসাব থোড়া বৈঠিয়ে—সাব বাহার গিয়া।'

আমি অত্যন্ত হতাশ হ'য়ে গেলাম। এত কষ্ট ক'রে বাড়ি খুঁজে এলাম, তাও কিনা বাবু বাড়ি নেই। উদ্বিগ্ন-ভাবে বললাম, 'সাহেব কখন আসবেন জানো?' মাথা নিচু ক'রে বয় বিনয়ের ভঙ্গিতে বললে, 'এই আব্‌ ভি আ যায়গা মাইজি—আপ থোড়া বৈঠিয়ে।' বসলাম একটুখানি। তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগলাম এদিক-ওদিক। কিন্তু মিনিট পনেরো কাটলো, তবু সমীর এলো না। কতক্ষণ আর বসবো। তার চেয়ে বরং একখানা চিঠি লিখে রেখে চ'লে যাই। বয়কে বল্‌তেই সে পুরু নীল কাগজের একটা প্যাড্‌ আর কলম নিয়ে এলো। প্যাডের মলাটটি ওলটাতেই অর্ধ-সমাপ্ত একখানা চিঠি চোখে পড়লো। সমীরের হাতের লেখা এতদিনেও একটু বদলায়নি দেখলাম। পাতাটা

ওলটাতে গিয়ে হঠাৎ একটা জায়গায় আমার নামটা চোখে পড়তেই আমি থমকে গেলাম। বুঝতে পারছিলাম খুব অন্যায় হবে তবু কিছুতেই চিঠিটা পড়বার লোভ সামলাতে পারলাম না। চিঠিটি কোনো-একজন বন্ধুকে লেখা, এবং তা এই রকম—

'তুমি আমায় জিজ্ঞেস করেছো, এখনো কেন আমি বিয়ে করতে চাই না। মা-বাবা কষ্ট পাচ্ছেন সে কথার উল্লেখ করতেও ভোলোনি। মা-বাবার মনের কথা জানিনে—আমি নিজে যে বিয়ে না-ক'রে কষ্টে নেই এ-কথা তুমি বিশ্বাস কোরো। তাছাড়া বিয়ে যদি করতেই হয় তবে আমার মতে মা-বাবাকে সুখী করবার চাইতে নিজের সুখের কথাটাই বেশি ভাবা দরকার। কিন্তু আসলে সুখী হবার যোগ্যতাই বোধ হয় আমার নেই, নয়তো অকারণে এমন একটা অনর্থ ঘটবে কেন! এখন অবশ্য খুব স্পষ্টই বুঝতে পারছি যে আমি আগাগোড়াই মণিকে ভুল বুঝেছিলাম। কিন্তু তখন মনে হয়েছিল—যাকৃগে, সে-কথা ব'লে আর কী হবে। তবে এটুকুই বাঁচোয়া যে মণিও বরাবর আমাকে ভুল বুঝেছিলো। নয়তো লজ্জায় আমাকে ম'রে যেতে হ'তো। তুমি বলবে এ-সব কথা দুঃখবিলাস মাত্র—যথেষ্ট সময় কাটলে এ দাগের

উপর পলিমাটি পড়বে সে-কথাও সত্য, তবে যতদিনে সেই সুদিন আসবে, ততদিনে—'

এই পর্যন্ত লিখেই চিঠিটা শেষ হ'য়ে গেছে। চিঠিটা পড়বার পরে আমি একটু ব'সে রইলাম চুপ ক'রে, তারপর মলাট উল্টিয়ে প্যাড্‌টি বয়ের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে আস্তে নেমে এলাম সিঁড়িতে। ঠিক শেষ সিঁড়িটির মুখেই সমীরের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো একেবারে মুখোমুখি।

'আরে মণি যে, এসো, এসো।' বিস্ময়ে আনন্দে সমীর থমকে দাঁড়ালো।

'অনেকক্ষণ ব'সে ছিলাম, এবার আমাকে যেতেই হবে।'

'ক্ষেপেছো নাকি—একটু বসবে চলো'—দু'সিঁড়ি লাফিয়ে উঠে ও আমাকে ডাকতে লাগলো। আমি তবু নেমে এলাম নিচে—'সত্যি সমীর, এবার আমার না-গেলেই নয়।'

সমীর আস্তে-আস্তে নেমে এলো কাছে, আর আমি একটু ফিরে দাঁড়ালাম, চকিতে তাকালাম ওর মুখের দিকে।

সমীর সঙ্গে-সঙ্গে এলো একটুখানি, তারপর দাঁড়িয়ে রইলো স্থির হ'য়ে।

মনটা বড়ই খারাপ লাগছিলো, কিন্তু আমি কী করতে পারি?

নিরুপমার চোখ

নিরুপমাকে আমি পড়াই। পড়াই আমি দু'বছর যাবত, তখন নিরুপমা ছিল চোদ্দ বছরের মেয়ে, এখন তার ষোলো। ওর ঠাকুরদা বলেন এই সবে বারো পেরিয়ে তেরোয় পা দিলো।

অতিশয় সনাতনী ভাব ওর বাপ-ঠাকুরদার। যতক্ষণ পড়াই সমস্তক্ষণ ওদের পুরোনো আমলের চাকর হরিসাধন শাসক এবং প্রহরীরূপে সেখানে মোতায়েন থাকে, মাঝে-মাঝে ওর কর্মহীন ঠাকুরদাও তাঁর জরাজীর্ণ দেহ নিয়ে শয্যা ছেড়ে উঠে আসেন নাত্‌নিকে দেখতে। আর নিরুপমা নতমুখ আরো নত করে, তার সংকুচিত দেহ আরো কুঞ্চিত হয়। শীত-গ্রীষ্ম তাকে ফুল্‌হাতা জামা পরতে দেখি, তা ছাড়া সমস্ত শরীরকে সে শাড়ি দিয়ে এমনভাবে আবৃত ক'রে রাখে যে একমাত্র হাতের আঙুল ক'টি ছাড়া আর-কিছুই দেখবার উপায় নেই। মুখখানা এতই নিচু ক'রে রাখে যে টানা ভুরুর তলায় ফোলা-ফোলা দুটি চোখের পাতা আর টিকোলো নাকটিই শুধু চোখে পড়ে। অদ্ভুত মাষ্টারি আমার। এ-রকম

বোবা পড়ানো যে কী দুঃসাধ্য-সাধন তা কেবল আমিই জানি। অনেকদিন বিরক্ত হ'য়ে কাজ ছেড়ে দিতে চেয়েছি, কিন্তু মন থেকে সায় পাইনি। মাস গেলেই কুড়িটা টাকা, অতএব লজ্জাই স্ত্রীলোকের অঙ্গের ভূষণ ব'লে নিরুপমাকে দু'বছর যাবত কেবল ক্ষমাই ক'রে আসছি। নিরুপমার ঠাকুরদা বলেন তাঁদের নিরুর বয়স তেরো হ'লে কী হবে, দেখতে সে বেজায় বড় হয়ে গেছে, যদি ভালো ছেলে-টেলে খোঁজে থাকে—আমি মুখে বলি 'নিশ্চয় নিশ্চয়', আর মনে-মনে ভাবি ঐ বোবাকে বিয়ে করতে ব'য়ে গেছে মানুষের। এমন অশিক্ষিত লজ্জার স্তূপ নিয়ে মানুষ করবে কী? আড়-চোখে চেয়ে দেখি তার মুখের ভাব কিছু বদলালো নাকি, কিন্তু আশ্চর্য, চোখের পাতাটি পর্যন্ত তার নড়ে না।

আমার নাম বিমলানন্দ। থর্ড ইয়ারে উঠেই এই টিউশনিটা পেয়েছিলাম। বাপ অর্ধ পয়সার মালিকও ক'রে যাননি। বিধবা মাকে নিয়ে জ্যাঠার আশ্রয়ে দিন কাটছিলো। স্কলারশিপের টাকায় পড়া চলতো, এই টিউশনিটা পেয়ে হাতে স্বর্গ পেলাম। নিরুপমার বাবা সদানন্দবাবু আমার বাবাকে চিনতেন এবং আমাদের বর্তমান অবস্থা জানতেন ব'লেই অবিশ্যি আমার ভাগ্য খুলেছিলো। নচেৎ আমার মতো

একজন যুবক যে তাঁদের মেয়ের মাষ্টারি করছে এটা ভারি আশ্চর্য। আমি প্রত্যেকদিন সাড়ে-ছ'টা বাজতেই সকালে পড়াতে যাই। গেলেই সর্বপ্রথম ঠাকুরদা উঁকি দেন, তারপর আসে নিরুপমার ছোট ভাই শঙ্কর—অবশেষে হরিসাধনের সঙ্গে-সঙ্গে অত্যন্ত মৃদুগমনা নিরুপমা বই আর কাপড়ের স্তূপ সামলাতে-সামলাতে এসে আমার উল্টোদিকের চেয়ারে বসে। লজ্জাটা ছোঁয়াচে, আমারও যেন চোখ তুলে তাকাতে লজ্জা করে তবু গলা-খাঁকারি দিয়ে ন'ড়ে-চ'ড়ে বসি। নিঃশব্দে নিরুপমা হোমওআর্কের খাতাটি বের করে, আর আমি সেটা টেনে নিয়ে ভুল থাকলে শুদ্ধ করি। ততক্ষণে জানি নিরুপমা ইংরেজি বইয়ের নির্দিষ্ট পাতায় চোখ ডুবিয়েছে। নির্ভুল গতিতে চলে এই নিয়ম।

আমাদের পাড়ায় আর-একটি মেয়ে আছে। তার নাম সুমি, অর্থাৎ সুমিতা। এ মেয়েটি আবার একেবারে নিরুপমার উল্টো। লজ্জা-সরমের বালাই নেই, সময়-অসময়ে ছুটে-ছুটে এ-বাড়ি আসে, আমি নিঃস্ব পর জেনেও আমার সঙ্গে ফাজলেমি করে, ঘুমিয়ে থাকলে মুখে চুনকালি মেখে রাখে, পড়াশুনোর ব্যাঘাত করে এবং নাম ধ'রে ডাকে। আমি কখনো-কখনো অন্যের সামনে ভারি কুণ্ঠিত বোধ করি; কিন্তু

ওর সংকোচ নেই। ওর বাবার পয়সা আছে, কাজেই প্রতিপত্তিও আছে।. অতএব আমার জ্যাঠাইমা আবডালে ওকে অসভ্য মেয়ে ব'লে অভিহিত করেন এবং সামনে প্রশ্রয়ের সীমা থাকে না। আমার মা ওকে সত্যিই ভালোবাসেন। আমার এক বোন অল্প বয়সে মারা যায়, বেঁচে থাকলে অত বড়ই হতো, হৃদয়ের এই দুর্বলতার সুযোগেই সুমি আরো আপন হয়ে ওঠে মা-র কাছে। সুমির বয়স যাই হোক, তার সরলতা ও নিঃসংকোচ দাপাদাপি সত্যিই মমতা কাড়ে। দৃষ্টিকটু হ'লেও অনেক সময় তাকে বকতে মায়া হয়। আবার মা বলেন যত মেয়ে তিনি আজ পর্যন্ত দেখেছেন তার মধ্যে সুমির মত ভালো তাঁর কাউকেই লাগেনি। এমনকি নিজের মেয়ে থাকলেও ওর চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন কিনা সন্দেহ। আমি ঠাট্টা ক'রে বলি নিজের মেয়েকে না হ'তে পারে বৌকে নিশ্চয়ই বেশি ভালোবাসবে। মা হাসেন, তারপর বলেন, কপালের কথা বলা কি যায়। সুমির বাবার বিত্তানুরাগ আছে। কথাটা খচ্ ক'রে বেঁধে মনের মধ্যে। ও, এই বুঝি মা-র মনের কথা। এক রবিবার দুপুরে নিরালা বুঝে খপ্ ক'রে সুমির আঁচল টেনে বলি, 'এই সুমি—'

ভুরু কুঁচ্‌কে সুমি জবাব দেয়, 'কী?'

জবাবটার মধ্যে একটুও যদি রস থাকতো।—'সারা দুপুর এ-রকম ছুটোপুটি করো কেন?'

'তাতে তোমার কী?'

'আমার ভালো লাগে না।'

'না লাগলো তো ব'য়ে গেল।'—সুমি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন ক'রে চ'লে যেতে চায়।

'যেয়ো না, শোনো—'

'না, আমি শুনবো না।'

'কেন শুনবে না?'

'আমার ইচ্ছে।'

'না, অত ইচ্ছে আর খাটবে না—তোমার বাবা আমার কাছে তোমাকে অঙ্ক কষতে বলেছেন দুপুরবেলা।'

'ঈস্'—সুমি আমার হাত ছাড়াতে চেষ্টা করে।

আমি শক্ত ক'রে চেপে রেখে বলি, 'তোমার একটুও লজ্জা নেই কেন? আমার ছাত্রী নিরুপমা তোমার থেকে মাত্র এক বছরের বড়, সে আমার কাছে দু'বছর যাবত পড়ছে কিন্তু আজ পর্যন্ত সে আমার দিকে চোখ তোলেনি।'

এবার কিন্তু অত বড় নির্বোধ সুমিরও আত্মাভিমানে আঘাত লাগে। ভারি আশ্চর্য, যত বোকাই হোক বা যত

সরলই হোক মেয়েরা কখনোই অন্য মেয়েদের প্রশংসা সইতে পারে না। তাই সুমির ঐ শিশু-চোখেও একটু অভিমানের আভাস দেখা দেয়। বলে, 'সে-কথা আমাকে বলবার হয়েছে কী?'

হেসে বলি, 'তাতে যদি তোমার একটু শিক্ষা হয়।'

'শিক্ষা?'—আচম্বিতে সুমি প্রচণ্ড এক চিমটি কেটে পালিয়ে যেতে-যেতে বলে, 'ও-সব শিক্ষা তোমার ছাত্রীকেই শিখিয়ো, আমার সঙ্গে লাগতে এসো না।'

মা-র পছন্দ যে একটুও ভালো না সে-বিষয়ে এবার নিঃসন্দেহ হই। মার আসল নজর কি ঐ সুমিই, না সুমির বাপ? মার মুখে অনেকদিন শুনেছি আমাকে বিয়ে দেবেন মুরুব্বি দেখে। তাঁর আইডিয়েল মুরুব্বি বোধ হয় তাহ'লে সুমির বাবাই। মার ঘরে গিয়ে দেখি সুমি আচার খাচ্ছে চেটে-চেটে। শুনতে পাই, 'কাকিমা, কি সুন্দর আচার করো তুমি।' কাকিমা বলেন, 'আর-একটু খাবি নাকি?' সুমি নিশ্চয়ই আরো চাইতো। আমাকে দেখেই বলে, 'ঐ এসেছেন তোমার আদুরে ছেলে,—এখানে কেন, যাও না তোমার ভালো ছাত্রীর বাড়ি।'

আমি বলি, 'মা, সুমিকে আর আচার দিয়ো না, ওকে অবিশ্রান্ত প্রশ্রয় দাও ব'লেই ও আমাকে মান্য করে না।'

'আহা রে—কী আমার মান্যবরেষু—' মুখের এক অপূর্ব ভঙ্গি দেখিয়ে সে আবার আচারে মনোনিবেশ করে। মুখভঙ্গি দেখে হেসে ফেলি।

দিন কয়েক পরে মা হঠাৎ বলেন, 'বিমল, এখন তো তুই বিয়ে করলেও পারিস।' বিস্মিত চোখে তাকাই—মা কি লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখছেন নাকি? আমি যেখানে নিজেই পরান্নে প্রতিপালিত সেখানে আমার অন্নপুষ্ট হবার জন্য কাউকে আমন্ত্রণ করা কি একান্তই পাগলামি নয়? মার মুখ কিন্তু হাসি-হাসি। বলেন—'কথায়-কথায় তোর জ্যাঠা সুমির সঙ্গে তোর বিয়ের কথা পেড়েছিলেন—সুমির বাবার আপত্তি নেই। ঐ তো একমাত্র মেয়ে, ভদ্রলোক তো টাকা দিতে অপারগ নন—তিনি ঠিক এই রকম ছেলেই চান যাকে নিজের মন-মতো গ'ড়ে নিতে পারবেন।'

মার কথা শুনে আত্মসম্মানে আঘাত লাগে আমার। ভুরু কুঁচকে বলি 'গ'ড়ে নেওয়া মানে? আমি কি একটা মাটির ডেলা?'

নিতান্ত নিরুদ্বেগে মা বলেন 'এই বিলেত-টিলেত পাঠানো আরকি!'

বিলেত! আজন্মের স্বপ্ন আমার বিলেত। মনের ভাব চেপে একটু চুপ ক'রে থেকে বলি 'যত সব বাজে কথা তোমাদের, খেয়ে-দেয়ে কি আর কোন কাজ পাও না?'

এবার মা রাগ করে বলেন, 'তোর ভালোর জন্যেই আমার চিন্তা তা নৈলে আর কি। এ বিয়ে যদি তোর হয় তা হলে বুঝবি নিতান্তই তোর বরাৎ ভালো। রাজকন্যা আর রাজত্ব তোর কাছে আপনা থেকেই—' 'থাক্, থাক্'—মাকে আর কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে সেখান থেকে পালাই। কিন্তু কথাটা ভাববার মত বইকি! টাকা আমার নিতান্তই দরকার—তবু বিয়ের কথাটা আমার যেন কিছুতেই ভালো লাগে না।—বাড়িতে চল্‌ছে ফিস্‌ফাস্ গুঞ্জন—সুমি কি জানে?

একদিন সুযোগ মতো আবার ধরলুম সুমিকে। বল্লুম 'এই, এখন আর রাত-দিন আমাদের এখানে এসো না।'

'কেন?'

'কেন আবার কী, তুমি জানো না কিছু?'

সুমি চুপ ক'রে তাকিয়ে রইলো আমার মুখের দিকে। আমি বল্লুম 'তোমার বাবা যে আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে—'

'অসভ্য'—আচমকা ঠাস্ ক'রে সে আমার পিঠে একটা চড় মেরে ছুটে পালালো। আমি আহত পিঠে হাত বুলোতে-বুলোতে ভাবলুম ওর হাতে শেষে মার খেয়ে মরবো নাকি?

সন্ধেবেলা ডাক পড়লো জ্যাঠামশায়ের ঘরে। আমাকে দেখেই বল্লেন, 'আমাদের সকলেরই তো খুব ইচ্ছে, তুমি বল্লেই হয়। এতে অমত কোরো না—জীবনের সমস্ত উচ্চাশার মেরুদণ্ডই হ'লো টাকা—আর তুমি যখন ভালো ছাত্র তখন বিলেত-ফিলেত যদি একবার ঘুরে আসতে পারো—' এর পরের কথাটি জ্যাঠামশায় ভাবভঙ্গী দিয়ে বুঝিয়ে দাড়িতে হাত বুলোতে লাগলেন।

আমাকে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বল্লেন, 'আচ্ছা ভেবে ছাখো গিয়ে—কালকে বোলো।'

বলাই বাহুল্য, সুমির বাবার টাকা আমাকে লুব্ধ করলো এবং মাসখানেকের মধ্যে পাকা হ'য়ে গেলো আমাদের বিয়ে। সকলেই সুমিকে নিয়ে আমাকে ঠাট্টা ইয়ার্কি করে—সকলেরই ধারণা সুমিকে আমি ভালোবাসি, তাই এই বিয়ে। খুব এক রোমান্টিক ব্যাপার। আমি কিন্তু এখনো সুমিকে স্ত্রী ব'লে কল্পনা ক'রে একটুও আনন্দ পাই না—আগের মতো সব সময় আসে না বটে, কিন্তু এলে আমার সঙ্গে দেখা হয়ই,

এ-কথা একবারও মনে হয় না দুদিন বাদে ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে—একটু লজ্জা, একটু আনন্দ, কিছুটা নেশা, সমস্ত-কিছুর একটা মিশ্রণে হৃদয়কে অভিভূত করতে চেষ্টা করি, কিন্তু ওকে কাছে দেখলেই সমস্ত উবে যায়। তবে কি সুমিকে আমি পছন্দ করি না, ভালোবাসি না? না, তাও নয়, আসলে সুমির সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ তাতে স্নেহ-মমতা যথেষ্ট আছে, কিন্তু প্রেম নেই।

যেদিন বিয়ে তার দুদিন আগেই নিমন্ত্রণ চিঠিখানা পকেটে ক'রে নিরুপমাকে পড়াতে গেলাম। দিন কয়েক পড়াতে আসবো না এ-কথা বলবার ইচ্ছে ছিল। পড়াশুনো শেষ ক'রে তাকিয়ে দেখলাম হরিসাধনের নির্দিষ্ট বসবার স্থানটি শূন্য। চিঠিখানা অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে পকেট থেকে বের ক'রে অনেক ইতস্তত ক'রে বললাম, 'আপনার ঠাকুর্দা কি বাড়ি নেই?'

নিরুপমা মাথা নেড়ে জানালো, নেই।

'কোথায় গেছেন?'

অত্যন্ত মৃদুস্বরে জবাব এলো, 'পিসিমার বাড়ি।'

'এই চিঠিখানা—' ব'লে চিঠিখানা টেবিলে রাখলাম, কিছু বলতে বড়ই লজ্জা করতে লাগলো। কিন্তু হঠাৎ মনে হ'লো

নিরুপমা চঞ্চল হয়েছে এবং ওর শাড়ির ভিতর থেকে একখানা হাত দ্রুত বেরিয়ে এলো চিঠিখানার উপর—নিমেষে চোখ বুলিয়ে হঠাৎ মুখ তুলে এমন এক দৃষ্টি নিয়ে স্থির হ'য়ে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো যে আমি খানিকক্ষণের জন্য ওর সেই দৃষ্টির কাছে আচ্ছন্ন হ'য়ে রইলাম। এই প্রথম দেখলাম ওর চোখ। কী যে ছিলো সেই চোখে আমি জানি না, কেন ও-কাজ করলাম তা-ও জানি না। হঠাৎ নিরুপমার হাত থেকে চিঠিখানা কেড়ে নিয়ে কুটি-কুটি ক'রে ছিঁড়ে ফেলে বেরিয়ে এলাম বাইরে। সাইকেলে ওঠবার আগে আর-একবার পিছন ফিরে তাকালাম, দেখলাম দুই হাতে মুখ ঢেকে ও ব'সে আছে শক্ত হ'য়ে।

তারপর আজ! এই ভোরবেলা উঠেই আমি বিমর্ষ মুখে মাকে ব'লেছি, 'মা, শেষ রাত্রের দিকে ভারি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম।' মা আজকাল সর্বদাই ব্যস্ত, কী কাজে যেতে-যেতে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কী স্বপ্ন?'

'থাক, বলবো না—'

'আহা, বল্ না।'

'না, শুনলে তোমার মন খারাপ হবে।'

মার কৌতূহল বেড়ে গেলো। এবার বিছানায় ব'সে

প'ড়ে, বললেন, 'নে,' নে, শিগ্‌গির বল্‌, আমার কত কাজ।'

'বাবাকে দেখলাম—'(একটু থামলাম এখানে), 'উনি বললেন, "বিমল, আর ছু'মাস পরে তোকে এখানে পাবো, কিন্তু আমার তাতে সুখ হচ্ছে না" ' (মার চোখ বড়-বড় হ'য়ে উঠেছে) ' "তুই সংসারে থাকবি, সুখী হবি, সর্বোপরি তোর দুঃখিনী মায়ের আশ্রয় হবি এই আমি চেয়েছিলাম, কিন্তু যার সঙ্গে তোর বিয়ে হচ্ছে সে-মেয়ের ছু'মাসের মধ্যেই বৈধব্য লেখা আছে।—" '

'সর্বনাশ!'—মার মুখ দিয়ে কথাটা ঠিক আর্তনাদের মতো বেরুলো। মুহূর্তে বাড়িতে রাষ্ট্র হ'য়ে গেলো এই স্বপ্ন—কোথায় গেলো খাওয়া-দাওয়া, গান-বাজনা, আত্মীয়-কুটুম্ব—খবর গেলো সুমির বাবার কাছে– বিষম ব্যাপার একমুহূর্তে। আমি ফাঁক বুঝে চম্পট দিয়েছি—এবং সবেগে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছি নিরুপমাকে পড়াতে।

এখন আপনারাই বলুন, কাজটা কি আমি খুব অন্যায় করেছি? কিন্তু নিরুপমা কেন চোখ তুলে তাকালো?

মুক্তি

মেয়ের উপযুক্ত পাত্র সন্ধান ক'রে-ক'রে অনাদিবাবুর স্ত্রী প্রায় পাগল হ'য়ে উঠেছিলেন। এতদিনে তার অবসান হ'লো। মেয়ে তাঁর সুন্দরী, শিক্ষিতা, গায়িকা, গুণের অন্ত নেই—আর সবচেয়ে বড় গুণ—বড়লোক, বাপের একমাত্র সন্তান সে। এমন মেয়েরও কি পাত্রের অভাব হয়? কিন্তু হয়েছিলো। মেয়ের না-হ'লেও মায়ের বিচারে বাংলা দেশে পাত্রের বড়ই অকাল লেগেছিলো। অবশেষে ভাবনা তাঁর ঘুচলো।

সবিতার যে সম্মতি ছিলো না তা তার মুখ দেখলেই বোঝা যেতো, কিন্তু ওর কি বুদ্ধি আছে? যেমন বাপের মেয়ে তেমন তো হবে। স্বামীর বুদ্ধির উপর চিরদিনই হেমলতা দেবীর দারুণ অবজ্ঞা অথচ একটা মাত্র সন্তান সেটাও ঠিক তাঁরই প্রতিমূর্তি। যাক্, বাপে-মেয়েতে যে কোনো কেলেংকারি না-ক'রে ভালোয়-ভালোয় রাজি হ'লো এ-ই যথেষ্ট। এখন দু'হাত এক করতে পারলেই শান্তি।

চারটা না-বাজতেই তিনি মেয়েকে তাড়া দিলেন, 'যা, যা, এক্ষুনি প্রস্তুত হ'য়ে নে গে, প্রতাপ এসে ব'সে থাকবে নাকি?'

অসন্তোষের চিহ্ন সবিতার সমস্ত মুখে ফুটে উঠলো—কিন্তু মায়ের উপর কথা বলা তার অভ্যেস নেই—সুইচ্ টেপা কলের মতো সে বই রেখে তোয়ালে নিয়ে ঢুকলো এসে বাথরুমে। কিন্তু বাথরুমে তো সে স্বাধীন; দরজা বন্ধ ক'রে চুপ ক'রে ব'সে রইলো দেয়াল ঘেঁষে।

এই প্রতাপকে নিয়ে ঠিক ক'জন হ'লো? মনে-মনে সে হিসেব করলো। প্রথমবার কিন্তু তার ভালোই লেগেছিলো। তখন সবে সে ষোলোয় পা দিয়েছে। সুধীরকে সে সরল অন্তঃকরণেই ভালোবেসেছিলো। এখনো মনে হয় তার কথা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মার পছন্দ হ'লো না। স্পষ্ট মনে আছে মার শিক্ষামতো প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে তার চোখ ভ'রে গিয়েছিলো জলে, কথা বলতে-বলতে গলা ভেঙে গিয়েছিলো। তবু সে মার ইচ্ছার বাইরে পা বাড়াতে পারেনি—জোর ক'রে বলতে পারেনি নিজের কথা।

তার ঠিক ছ'মাস পরেই অবনী পালিত আর নলিনাক্ষ রুদ্র একসঙ্গে। দু'জনেই মার চোখে সমান প্রতিযোগী। অবনী পালিতের বাপের টাকার খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত আর নলিনাক্ষ স্বয়ং আই. সি. এস্.। শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি খসলো দু'জনেই, কেননা দু'নৌকোয় পা রাখা আর খাটলো না। কিন্তু চিহ্ন

রইলো অনেক শরীরে মনে আর দামি দামি উপহারে। উপহারগুলোই মার সান্ত্বনা হ'লো। এর পরে সেই চিরলম্পট পান্না সেন! উঃ—সবিতা শিহরিত হ'য়ে উঠলো সে-লোকটার কথা ভেবে। মন থেকে মুছে ফেলতে চাইলো সে-সব কথা, তারপর ঝরনা খুলে দাঁড়ালো নিচে। সমস্ত শরীর বেয়ে নামলো শান্তির ধারা।

টাকা! টাকা! টাকা! হেমলতা দেবীর আর যথেষ্ট মনে হয় না কিছুতেই—অবশেষে এই প্রতাপ। অনেক বার তিনি বঁড়শিতে মেয়েকে গেঁথে টোপ ফেলেছেন, কিন্তু টোপ যতই শাঁসালো হোক্ না, ঠুক্রেছে সব চুনোপুঁটি—অন্তত তাঁর তাই ধারণা। কিন্তু এই প্রতাপ—কে হিসেব করবে সে কত টাকার মালিক। দুষ্টু লোকে রটায় বটে ওটা অমানুষ—অমানুষ আবার কী। টাকাই পুরুষমানুষের মনুষ্যত্ব—টাকাই স্ত্রীলোকের সুখশান্তি। হ্যাঁ, বলবার মতো বটে তাঁর জামাই। কে না চেনে প্রতাপ সিংহের বাপ অমর সিংহ আর তার বাপ দীনদয়াল সিংকে? কে কবে তল পেয়েছে তাদের তিন পুরুষের টাকার?

হেমলতার এতদিনের প্রতীক্ষা সত্যিই সফল হ'লো।

অনাদিবাবু চোখে চশমা এঁটে ভাবতে বসলেন এটা ঠিক

হ'লো কিনা, এ-বিয়েতে সবিতার সম্মতি আছে কিনা। জিজ্ঞেস করতে হবে। হ্যাঁ, জিজ্ঞেস তো করাই উচিত—বিয়ে হচ্ছে তার—ইচ্ছা অনিচ্ছা তো তারই—হেমলতার কী! সভয়ে তিনি একবার চারদিকে তাকালেন—কে জানে, হেমলতা আবার মনের কথাও শুনে ফেলেন।

স্নান ক'রে বেরিয়ে এলো সবিতা। মন তার শান্ত হয়েছে, স চিন্তা ক'রে দেখেছে সুখ দুঃখ ব'লে সংসারে কিছুই নেই—নমস্তই মেনে নেয়া না-নেয়ার প্রশ্ন। প্রতাপকে তার ভালো মনে হয় না—বেশ তো, নাই বা হ'লো ভালো, তাতে তার কী এসে যায়? বিয়ের পরে মুঠো-মুঠো টাকা সে মাকে এনে দেবে—ব্যস্। সুখ কী? সে কী রকম? আর দুঃখটাই বা কিসের? যত সব মনের বিকার। মৃদু হেসে সে লম্বা চুল মেলে দিয়ে অত্যন্ত প্রশান্তচিত্তে অনাদিবাবুর ঘরে এসে দাঁড়াতেই হেমলতা ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন, 'এখনো তোর হয়নি, কী আশ্চর্য! প্রায় পনেরো মিনিট ধ'রে প্রতাপ এসে ব'সে আছে।'

সবিতার মন এতক্ষণের চেষ্টাকৃত সংযমের বাঁধ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইলো, কিন্তু হেমলতার চোখের দিকে তাকিয়ে বাঘের ভয়ে ভীরু হরিণের চকিত গতিতে সে ফিরে এলো প্রস্তুত হ'তে।

প্রতাপ একেবারেই স্বাধীন। মা-বাপের বালাই তো অনেকদিনই চুকেছে, এক পিসি ছিল সেও গত প্রায় মাস ছয়েক যাবৎ। (এটাও হেমলতার একটা আকর্ষণ। তিনি পছন্দ করেন না মেয়ের স্বাধীনতায় অন্য-কোনো গুরুজন অন্তরায় থাকেন।) বিবাহের যা-কিছু সমস্ত প্রতাপকে একাই করতে হবে। ব'লে গিয়েছিলো সবিতাকে কী কী তার জন্য কিনতে হবে তার একটা লিষ্টি ক'রে রাখতে। কথাটা হেমলতার অগোচর ছিলো, কাজেই গাড়িতে উঠেই দেখা গেলো সবিতা সেটা করেনি। প্রতাপের এত তাড়াতাড়ি গাড়ি নিয়ে আসবার কারণই ছিলো এটা। একটু বিরক্ত হ'য়ে বল্লে, 'তোমার দেখছি কিছুই মনে থাকে না'।

'তা একটু কমই থাকে'।—হেমলতার অসাক্ষাতে সবিতা একটু-আধটু স্বাধীন ইচ্ছায় কথা বলতো। অবিশ্যি মায়ের প্রভাব সে সর্বদাই অনুভব করতো তার ভীরু মনের মধ্যে। আর তার নির্দেশও সে পালন করতো যথাযথভাবে—এবং এ-সব ক্ষেত্রে মনোরঞ্জনের নির্দেশটাই যে মুখ্য সেটাও সে জানতো, তবু মাঝে-মাঝে মন তার শক্ত খুঁটি আলগা করবার চেষ্টায় ছটফট ক'রে উঠতো।

এবার প্রতাপ একটু রসিকতার চেষ্টা ক'রে বল্ল, 'তবে'

তো তোমার একটু স্মরণশক্তির চর্চা করা দরকার! মনে না-রাখাটা যদি শেষে এই অভাগার উপর এসে পড়ে—' তাকালো সে সবিতার মুখের দিকে। সবিতা রসিকতাটা হয়তো হৃদয়ঙ্গম করতে পারলো না অথবা ইচ্ছে ক'রেই অন্যমনস্কতার ভাণ ক'রে চুপ ক'রে রইলো।

'চুপ ক'রে রইলে যে? কী হয়েছে?'

সবিতা মুখ ফিরিয়ে বল্ল, 'কী আবার হবে।'

'কী জানি, তোমার মনের কথা জানবার সৌভাগ্য কি আমার হয়?'—প্রতাপ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হ'য়ে বসলো—চেষ্টা করলো হাত ধরবার।

কিন্তু সবিতা তক্ষুনি হাত সরিয়ে নিয়ে বল্ল, 'আচ্ছা প্রতাপ, ক'টা দিনই বা আর আছে—অত অধীর হওয়া কি ভালো?'

অত্যন্ত অসহিষ্ণুভাবে প্রতাপ বল্ল, 'এ-কথারও কোনো মানে হয় না সবিতা, এ-রকম নিয়মমাফিক সাধ্বী থাকাও নেহাৎ হাস্যকর।'

কথাটা ঠিক বিদ্রূপের মতো শোনালো। সাধ্বী বলতে সাধারণত যা বোঝায় সত্যিই তো সবিতা তা নয়—এ-হাত কি আর-কাউকেই সে ছুঁতে দেয়নি? প্রণয়-ভাষণ কি

আর কারো মুখ থেকে সে শোনেনি? অনেক অসংযম—যা করা সত্যিই উচিত নয় তাও সে অনেকবার করেছে মায়ের প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায়ে। তবে প্রতাপের বেলাতেই কেন এই হাস্যকর বিতৃষ্ণা। ভাবতে গেলে একমাত্র প্রতাপেরই এ-সব প্রাপ্য—সে ফাঁকি দেয়নি—সত্যিই তার টাকা আছে সত্যিই মা তাকে নির্বাচন করেছেন, বিয়ে তাদের সত্যিই হবে। কিন্তু তবু—তবু কেন ভালো লাগে না, কেন আর ভালো লাগে না এই অভিনয়? সহসা হাসিমুখে সে নিজের হাত প্রতাপের হাতের উপর রেখে বল্ল, 'নাও, হ'লো? কী আছে হাতের মধ্যে বলতে পারো?'

'তুমি বোঝো না?

'না।'

'আশ্চর্য!' প্রতাপ একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'আমার এক-এক সময় মনে হয় কী, জানো? মনে হয় তোমার কোনো উত্তাপই নেই—তুমি যেন কলের মানুষ—কে চাবি টিপলো আর অভ্যেসমতো চলতে লাগলে তুমি।'

'হয়তো সেটাই সত্যি।'

'তবে—তবে কী চাও তুমি আমার কাছে?'—প্রতাপ উত্তেজিতভাবে ব'লে উঠলো।

সবিতার ঠোঁট পর্যন্ত একটা জবাব ঠেলে উঠে আবার বুকের মধ্যে মিলিয়ে গেল। মায়ের দুই চোখ ভেসে উঠলো তার চোখে—সে-চোখ যেন এক্ষুনি ফেটে যাবে ভর্ৎসনার ভাবে—ভয়ে সংকোচে সে এতটুকু হ'য়ে গেলো, ভেবে পেলো না প্রতাপের মন রাখবার জন্য এর পর তার কী করা উচিত।

হু হু ক'রে ছুটলো গাড়ি—প্রতাপ আর একটি কথাও বললো না তারপর। নির্দিষ্ট জুয়েলারের দোকানে এসে গাড়ি থামতেই প্রতাপ লাফিয়ে নেমে দুম্ ক'রে বন্ধ ক'রে দিলো দরজাটা। সঙ্গে-সঙ্গে সবিতার বুকের মধ্যে ধ্বক্ ক'রে উঠলো। প্রতাপ কি রাগ করলো? ষোলো থেকে তেইশ বছর বয়স পর্যন্ত—কত গেলো—কত এলো—সিনেমার মতো।—রীলে গাঁথা সব ছবি মনের মধ্যে তার কিলবিল ক'রে ফুটে উঠলো। কত কষ্ট ক'রে সে গ'ড়ে তুলেছে—কত সহজে সে ভেঙেছে। প্রতাপ যদি এখন বিয়ে না করে তবে ভাঙবে—আবার ভাঙবে, ভাবতেই সবিতার কান্না পেলো। সে আর-কিছু চায় না—চায় এ-সব থেকে মুক্তি। আর সে-মুক্তির দূত একমাত্র প্রতাপই তো—প্রতাপই তাকে বিয়ে ক'রে মুক্তি দেবে আর একমাত্র প্রতাপেরই এত টাকা আছে, যা তার মায়ের

আকাঙ্ক্ষাকেও ছাপিয়ে যায়। ছলছল ক'রে উঠলো সবিতার চোখ—বাধা দিলো না সে—মোটা-মোটা ফোঁটায় গড়িয়ে পড়তে লাগলো দুই গাল বেয়ে।

হঠাৎ সে লজ্জিতভাবে চোখে রুমাল ঘ'ষে হাসবার চেষ্টা করে বল্ল, 'হ'য়ে গেলো ?'—প্রতাপ কখন এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ির দরজা ধ'রে।

একটু পরেই একটা লোক প্রকাণ্ড এক মখমলের কেস্ এনে উঠিয়ে দিলো গাড়ির মধ্যে—তারপর মাথা নিচু ক'রে প্রতাপকে সম্মান জানিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো গাড়ি না-ছাড়া পর্যন্ত।

গাড়ি ছাড়তেই সবিতা বল্ল—'প্রতাপ, আমার যেন কেমন স্বভাব, ঝগড়া না-ক'রেই পারি না—তাই ব'লে কি তুমি আমার উপর রাগ করবে ?'

'না, রাগ কিসের।'

সবিতা এবার তার সমস্ত শরীর এলায়িত ক'রে (এটি তার অব্যর্থ ভঙ্গি) আবদারের সুরে বল্ল, 'কক্ষনো তুমি রাগ করতে পারবে না—' সঙ্গে-সঙ্গে সে প্রতাপের কাঁধে মাথা ছোঁয়ালো।

'ছাখো, সবিতা'— প্রতাপ গম্ভীরভাবে বল্ল, 'মেয়েদের

সমস্ত ভঙ্গি আমি চিনি—একমাত্র মেয়ে তো তুমিই নও যাবে প্রতাপ সিংহ আজই প্রথম প্রত্যক্ষ করলো। তেরো থেবে তেত্রিশ—এই কুড়ি বছর যাবৎ—তোমাকে বলাই ভালে —কী যে আমি করেছি আর কী যে করিনি তার হিসে দিতে গেলে একেবারে মহাকাব্য হ'য়ে দাঁড়ায়। স্ত্রীলো আমি খুব ভালো ক'রেই চিনি।'

লজ্জায় অপমানে সবিতার শরীরে আগুনের স্রোত ব' গেলো। তীক্ষ্ণস্বরে বল্ল—'এ-সব তাহ'লে গোপন করেছিলে'

প্রতাপ হাসলো—'ছাখো, গোপন তা আমার স্বভা নেই। আকারে-প্রকারে তোমার মাকে আমি সমস্ত কথা জানাবার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তিনি অত্যন্ত উদারমতে স্ত্রীলোক পুরুষের নৈতিকতা সম্বন্ধে।'

'হুঁ'—সবিতা বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো।

'তাই বলছি,' প্রতাপ আগের কথার জের টেনে ব 'আমার মনে হয় আমার সঙ্গে বিবাহ ব্যাপারে তোমা নিজের ব্যক্তিগত কোনো মতামত তুমি খাটাচ্ছো না।'

অত্যন্ত শান্তভাবে সবিতা মুখ ফিরিয়ে বল্ল, 'এতথা অগ্রসর হবার আগেই সুবুদ্ধিটা কাজে লাগালে কি ভাে হ'তো না?'

'অগ্রসর কী—কোনো অন্যায় ব্যবহার আমি তোমা
সঙ্গে আজ পর্যন্ত তো করিনি। তা আমি তোমার স
করতে পারি না।' —একটু থেমে—'ছাখো সবিতা' বল
বলতে প্রতাপের গলার স্বর হঠাৎ অদ্ভুত বদলে এলো—'আ
এখন শান্তি চাই, আর সে-শান্তি আমার তোমার মধ্যে
আমার ভালো নেই, মন্দ নেই, একমাত্র তুমি যদি'—গাড়ি
খচ্ ক'রে থেমে গেলো—সঙ্গে-সঙ্গে প্রতাপ যেন সম্বি
ফিরে পেলো। নিজের দুর্বলতা যে কখন কোন প
আত্মপ্রকাশ করলো এ-কথা ভেবে তার দস্তুরমতো লজ্জ
করতে লাগলো। এ তো তার উদ্দেশ্য ছিলো না—সিগারে
ধরিয়ে হাসিমুখে বল্ল, 'রামো, রামো, কী সব বাজে কথা
এতক্ষণ কাটলো—কী, নামছো না যে—ও, গয়নার দোকা
নিয়ে যাইনি ব'লে বুঝি অভিমান হয়েছে! না, না, এসে
লক্ষ্মীটি। শাড়ি কেনা কি পুরুষের কর্ম!'

সবিতার ইচ্ছে করলো না বাদানুবাদ করতে। নিঃশব্দে
নেমে এলো গাড়ি থেকে।

সবিতার ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় পছন্দে-অপছন্দে মিলি
এত শাড়ি প্রতাপ কিনলো যে তার উদ্দামতায় দোকানির
পর্যন্ত স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো।—গাড়িতে চ'ড়ে প্রতাপ প্রফুল্ল

মুখে বল্ল, 'তুমি নিশ্চয়ই ভাবলে যে টাকার দম্ভ দেখাচ্ছি কিন্তু সত্যিই তা নয়। এই নিয়ে আরো অনেকবার আমার শাড়ি গয়না কেনবার দরকার হয়েছে কিন্তু নিজের স্ত্রীর জন্য তো কখনো কিনিনি—এই কেনাতে যে এত আনন্দ লুকিয়ে ছিলো তা কি আমি জানতুম!'

সবিতা কথা বল্ল না। প্রতাপ আবার বল্ল, 'স্পষ্ট বুঝতে পারছি তোমার ভালো লাগছে না এ-সব, তুমি মনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারছো না, কিন্তু কী করতে পারি তাও তো ভেবে পাই না—নিজের সুখ যাতে হয়, তা আমি এ-জীবনে ছাড়িনি—অন্যের সুখ-দুঃখ ক্ষয়-ক্ষতি কিছুই আমাকে বিচলিত করে না—কী করবো বলো, এই আমার স্বভাব, আমি মানুষটাই এমন স্বার্থপর।' একটু থেমে, 'তবে আজকে ঠিক এই মুহূর্তে আমার মনের এমন একটা অবস্থা হয়েছে যাতে মনে হচ্ছে কারো জন্য কিছু করতে পারলে যেন ধন্য হ'য়ে যাই—যদি তুমি ইচ্ছে করো তাহ'লে এক্ষুনি এই মুহূর্তে আমি তোমাকে মুক্তি দিতে পারি—আমার মনে হচ্ছে এ-বিবাহ একান্তই তোমার মায়ের ইচ্ছায়।'

'প্রতাপ, একটা কথা শোনো,' অত্যন্ত শান্ত ভঙ্গিতে মোটরের পিঠে হেলান দিয়ে ব'সে ততোধিক শান্তভাবে

সবিতা বল্ল 'আমাকে তোমার অতীত জীবন শুনিয়ে লাভ আছে ? এ-কথা আর না-তোলাই ভাল। শুনে ছাখো, মাত্রই আর চার দিন আছে মাঝখানে—এখন আর কোনো হাঙ্গামা বাধিয়ো না—দয়া ক'রে আমাকে স্থান দাও তোমার ঘরে, এর বেশি কোনো আকাঙ্ক্ষা কোনো ইচ্ছা আর আমার নেই।' এর উত্তরে প্রতাপ কিছু বলবার আগেই ড্রাইভার মুখ ফেরালো—'সাব্, চা পিনেকো যায়েগা ?'

'যাবে ?'

'তোমার ইচ্ছা হ'লে চলো'—সবিতা বললো।

'থাকগে—নেই—তোম যাও আলিপুর।'

অনাদিবাবু আলিপুরে থাকেন। হেমলতা দোতলার বারান্দায়ই দাঁড়িয়ে ছিলেন—তাদের আসতে দেখেই ঝুঁকে বললেন, 'তোমরা এরই মধ্যে চ'লে এলে ?'

প্রতাপ নেমে হাত ধ'রে নামালো সবিতাকে, তারপর হাসিমুখে উপরের দিকে তাকিয়ে বল্ল, 'হ্যাঁ, শিগ্‌গিরই হ'য়ে গেলো'—বলতে-বলতে সে আবার উঠে বসলো গাড়িতে।

'এ কী, তুমি নাববে না ?' সবিতা আশ্চর্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলো।

'না, ভালো লাগছে না।'

'সে কী কথা !'—সবিতার মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়লো।

হেমলতা দেবী উপর থেকে ওদের কথা শুনতে পাচ্ছিলেন না, কিন্তু বুঝলেন প্রতাপ চ'লে যেতে চাইছে। ডাকলেন, 'সবি',—উপরের দিকে চোখ তুলতেই তিনি প্রতাপকে ধ'রে রাখার ইঙ্গিত জানালেন। কলের মতো সবিতা বলতে লাগলো, 'না, না, সে হয় না, তোমাকে নামতেই হবে—চা খাবে না ?' অত্যন্ত অনুনয়ের ভঙ্গিতে প্রতাপ বল্ল, 'তুমি একটুও রাগ কোরো না আমার উপর—সত্যিই কেন জানি আমার কিছু ভালো লাগছে না। আমি যাই।'—ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিলো, মুহূর্তে গাড়ি অদৃশ্য হ'য়ে গেলো সবিতার চোখের উপর।

এবার নেমে এলেন হেমলতা দেবী। অত্যন্ত ব্যস্তভাবে তিনি বল্লেন 'সে কী রে ! প্রতাপ চ'লে গেলো কেন ? কিছু বলিসনি তো ?' চারদিক তাকিয়ে—'কই, কিছু যে দেখছিনে ? কেনা-কাটা হয়নি ?'

'হয়েছে।'

'কোথায় সে-সব ?'

একটু উদ্ধতভাবে সবিতা ব'লে উঠলো, 'কী জানি, আমি জানিনে'···ব'লেই থতমত খেয়ে গেলো—মায়ের সঙ্গে

ও-ভাবে কথা বলা তার অভ্যেস নয়। · ভয়ে সে চুপ ক'রে গেলো।

'জানিনে মানে?' হেমলতা ভ্রূকুটি করলেন।

ভীতভাবে সবিতা বল্ল, 'ভুলে গেছে বোধ হয় রেখে যেতে—মা, কী বলবো'—সহসা সবিতা মায়ের মন জয় করবার পথটা যেন খুঁজে পেলো—হাসিমুখে বল্ল, 'এত কাপড় আর এত গয়না ও কিনে এনেছে আমার জন্যে যে তা দিয়ে বেশ বড় রকমের ছুটো দোকান খোলা যায়।'

চকিতে হেমলতার মুখের ভাব বদলে গেলো, কিন্তু ঠাট বজায় রেখে বল্লেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে'খন, উপরে চল্।'

পরের দিন সকালবেলা হেমলতা দেবী প্রতাপের আশায় ছট্‌ফট্ ক'রে কাটাতে লাগলেন। জিনিসপত্রগুলো না-দেখা পর্যন্ত যেন তাঁর মন আর শান্ত হ'তে পারছিলো না। সমস্ত প্রতীক্ষা ব্যর্থ ক'রে সারাটি সকাল কাটলো, প্রতাপ এলো না। ব্যগ্র হ'য়ে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে, কালও এলো না—রাগ টাগ করেনিতো?

'না, রাগ করবে কেন, বিকেলে নিশ্চয়ই আসবে।'

অনাদিবাবু চা খাচ্ছিলেন, (সময়-অসময়ে চা খাওয়া তাঁর

অভ্যেস) বল্লেন, 'নাই বা এলো একবেলা, অত অস্থির হবার কী হয়েছে ?'

'চুপ করো তো তুমি'—হেমলতা অস্বাভাবিক জোরে ধমকে উঠলেন—মনের বেগটা বেরুবার যেন একটা গতি পেলো,—'শরীরের ডাক্তারি ক'রেই তো চুল পাকিয়েছো, মনস্তত্ত্ব জানো কিছু ?'

খুব মৃদু গলায় অনাদিবাবু বল্লেন, 'আমার তো জানি ব'লেই ধারণা'—আড়চোখে তিনি তাকালেন দিকে।

'যদি জানতে তবে নাকে চশমা এঁটে অহোরাত্রি কেবল বই ঘেঁটেই দিন কাটাতে পারতে না। আমি হায়রান হয়ে গেলাম মেয়েটার বিয়ে নিয়ে, আর তুমি কী করেছো ?'

'আমি যে কিছু করিনি সেটাই তো আমার মনস্তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয়।'

'যাও, যাও'— হেমলতা বিরক্ত হ'য়ে উঠে গেলেন।

প্রতাপ কিন্তু বিকেলেও এলো না—পরের দিন সকালেও না—বিকেলের দিকে হেমলতা ফোন করলেন। প্রতাপকে পাওয়া গেলো না। সবিতার মনেও যথেষ্ট উদ্বেগের ছায়া পড়েছিলো। তার চোখে-মুখেই সে-কথা ছড়ানো। পরশু তাদের রেজিস্ট্রেসন অথচ প্রতাপের হ'লো কী! পরের দিন

রবিবার। বন্ধু-বান্ধবের আনাগোনা, শুভেচ্ছাজ্ঞাপনের পালা সমস্তই আরম্ভ হ'য়ে গেলো কিন্তু প্রতাপ এলো না। বিয়ে হচ্ছিলো খুব ঘটা ক'রেই। একমাত্র মেয়ে হেমলতার—বিয়ে হচ্ছে রাজপুত্রের সঙ্গে—এ-কথা আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব চেনা-অচেনা কাউকে বলতেই হেমলতা বাদ দেননি।

বাড়িঘর ভ'রে উঠলো কলরবে। অবশেষে অনাদিবাবুও একটু বিচলিত হলেন প্রতাপের অনুপস্থিতিতে। তাঁর জীবনে জ্ঞানত এম রবিবার কখনো যায়নি যেদিন তিনি উপাসনা ভুলে অন্য কাজে মন দিয়েছেন—কিন্তু সেদিন তার ব্যাঘাত হ'লো। তিনি মন্দিরে না-গিয়ে গেলেন খিদিরপুর প্রতাপের বাড়ি। বিরাট বাড়ি—কোথা দিয়ে যে কোনখানে ঢুকবেন যেন দিশে পেলেন না। কন্যা আর স্ত্রীর কাছেই এ-বাড়ি পরিচিত, তাঁর অভিযান এই প্রথম। কিন্তু কোথায় প্রতাপ? আমলা গোমস্তা, দাসদাসী, দরোয়ান সেপাই, কুকুর-কাকাতুয়া—বাড়িটি যেন একটি প্রকাণ্ড চিঁড়িয়াখানা —নানা জনে নানা কথা ব'লে তাঁকে বিদায় দিলো, কিন্তু কোথায় গেলে প্রতাপকে পাওয়া যায় সেটাই জানা গেলো না। হতাশ হ'য়ে তিনি বাড়ি ফিরে এলেন।

এদিকে গর্জাতে লাগলেন হেমলতা, 'দেবো ওকে—নিশ্চয়ই

জেলে দেবো—স্কাউণ্ড্রেল—হতভাগা'—মেয়ের উপরও তাঁর কম রাগ হ'লো না। অপদার্থ মেয়েটাই নষ্টের গোড়া, তাঁর অনুপস্থিতিতে কী বলেছে কী করেছে কে জানে। বাপেরই তো মেয়ে। গনগন্ করতে-করতে তিনি এলেন মেয়ের ঘরে। সবিতা চুপ ক'রে বসেছিলো জানলার পাশে, উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় লজ্জায় ঘৃণায় ইচ্ছে করছিলো তার ম'রে যেতে—ভয়ে সে তাকাতে পারলো না মায়ের চোখের দিকে। মাথা নিচু ক'রে নিঃশব্দে ব'সে রইল।

'সবি—সত্যি কথা বল্ তুই, সেদিন কী বলেছিস্ প্রতাপকে।'—সেই যে প্রতাপ ওকে নামিয়ে জিনিসপত্র না-রেখে চ'লে গেলো সেই থেকে হেমলতার মনে কন্যার নির্বুদ্ধিতা সম্বন্ধে এক বিষম সন্দেহ আলোড়িত হচ্ছিলো। তিনি তাঁর শ্যেনদৃষ্টিতে এটা খুব লক্ষ্য করতেন যে প্রতাপের যে-কোনো তুচ্ছতম প্রণয়ভঙ্গিতেও সবিতার মুখে অপরিসীম বিরক্তি ফুটে উঠতো।

মায়ের জেরায় সবিতা বিব্রত হ'য়ে উঠলো। ক্ষীণ গলায় বললে, 'কিছুই তো বলিনি, মা।'

'নিশ্চয়ই বলেছো'—মা'র স্বর চ'ড়ে উঠলো—'তোমাকে আমি চিনি না—সবটাতে তোমার মান যায়—সব জায়গায়

তোমার সুনীতি। পুরুষমানুষকে বিয়ে করতে হ'লে একটু প্রশ্রয় দিতেই হয়—'

সবিতার কান পুড়ে গেলো। মা আর কী বলবেন এর পর?

'মা, চুপ করো, চুপ করো'—সবিতা দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেললো।

রাত্রিতে অনাদিবাবু চিন্তিতমুখে পায়চারি করছিলেন আর ব'সে-ব'সে ভাবছিলেন কী করা উচিত।

কিমোনো গায়ে জড়িয়ে সবিতা ঘরে এলো। অনেকক্ষণ আগেই ও শুতে গিয়েছিলো—ওকে দেখে অনাদিবাবু পায়চারি থামিয়ে বল্লেন, 'তুই ঘুমোসনি, মা?'

'না, বাবা।'

'যা, যা, রাত করিসনে।'—অনাদিবাবু আবার হাঁটতে লাগলেন।

সবিতা মায়ের দিকে তাকালো, বল্ল, 'মা, আমার জন্য তোমাদের যত কষ্ট।'

হেমলতা জবাব দিলেন না।

অনাদিবাবু আবার বল্লেন, 'যা মা, রাত করিসনে—আমি এক্ষুনি আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়বো। তিনি টেবিলের ধারে

এগিয়ে এলেন। খুঁজতে লাগলেন চশমার খাপটা। কাগজ-পত্রে স্তূপ করা টেবিল—নিজের অগোছালো স্বভাবের জন্য বিরক্ত হলেন—দুই হাতে আবোলতাবোল কাগজ সরাতে-সরাতে হঠাৎ একখানা খামে ভরা চিঠির উপরকার হাতের লেখা দেখে তাঁর চোখ নিবদ্ধ হ'লো। চিঠিখানা বিকেলের ডাকে এসেছে, চাকররা রেখে গিয়েছিলো অভ্যাসমতো চাপা দিয়ে, কিন্তু চোখে পড়েনি অনাদিবাবুর—কিম্বা কোনো কাগজ খুঁজতে গিয়ে কার তলায় এটাকে তিনি ফেলেছিলেন তার ঠিক নেই। ফস্ ক'রে খুলে ফেললেন চিঠির মুখ—

'শ্রীচরণেষু,

বিশেষ কোনো কারণে আমি এ দু'দিন কলকাতার বাইরে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম, আজ এইমাত্র এলাম। এ দু'দিন নাওয়া-খাওয়ার সময়ও আমার ছিলো না তাই খবর দিতে পারিনি। আসবার আগে আমি ড্রাইভারকে ব'লে এসেছিলাম আপনার কন্যার জন্য যে-সব সামান্য জিনিসপত্র কেনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো তা পৌঁছে দিতে। ড্রাইভার আমার পাঁচ বছরের বিশ্বস্ত লোক কিন্তু এসে জানলাম জিনিসপত্র নিয়ে সে ফেরার হয়েছে। হাজার পাঁচেক টাকার গহনা আর শ পাঁচেক টাকার শাড়ি সেখানে ছিল। যা-ই হোক্, যা গেছে তা গেছেই, ভবিষ্যতে আপনাদের দয়ার যে-মূল্য আমি পাবো ব'লে আশা করছি তার আনন্দের কাছে এ-জিনিস

কেন—আমার সমস্ত জীবনও অতি তুচ্ছ। তবে আমার মতো দুর্ভাগার অদৃষ্টে বিধাতার এত আশীর্বাদ হয়তো নেই। আজকে আমি যে-সত্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি—তার মধ্যে কোনো ছলনা কোনো আড়াল রেখে আমি আর শান্তি পাচ্ছিনে। পাপ-পুণ্য জানিনে, তবে আজ মনে হচ্ছে এ-কথা স্বীকার না-করলে অন্যায় হবে যে আপনারা আমাকে যা ভেবে কন্যার যোগ্য বিবেচনা করেছেন আমি তা নই। এমনকি আমার বাড়িটি পর্যন্ত এখন দেনার দায়ে বাঁধা। মায়ের অজস্র গহনা বিক্রি ক'রে-ক'রে এতদিন তবু চলছিল কিন্তু তাঁর শেষ গহনাটির বিনিময়েই সেদিন আমি সবিতার জন্য কিছু কিনেছিলাম। এ-গহনাটি আমার মায়ের একান্ত সাধের ছিলো, এটি তিনি তার পুত্রবধূর জন্যই সযত্নে তুলে রেখেছিলেন —আমি তাঁর সেই অন্তিম ইচ্ছাই পূরণ করতে চেয়েছিলাম। বাকি আরো পাঁচহাজার টাকা ছিল তা থেকে, সে-টাকা আমি সবিতাকে দিলুম—যদি আমাকে আপনারা ত্যাগ করেন তবুও এ-সামান্য টাকাটা গ্রহণ ক'রে আমাকে চিরবাধিত করবেন।

আপনি মহৎ, আপনি আমাকে দয়া করুন—ক্ষমা করুন, আপনার দয়ার উপরই নির্ভর করছে আমার সমস্ত জীবন।

হতভাগ্য প্রতাপ'

চিঠি পাঠ শেষ ক'রে অনাদিবাবু উদাসভঙ্গিতে ব'সে পড়লেন চেয়ারের উপর—হেমলতা এতক্ষণ ভদ্রতা ক'রে ধৈর্য ধ'রে ছিলেন (ভদ্র হবার তাঁর যথেষ্ট প্রচেষ্টা ছিলো) এবার খপ্ ক'রে টেনে নিলেন চিঠিটা। তারপর পড়তে-পড়তে তিনি

অসম্ভব উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন। ছুঁড়ে দিলেন সবিতার দিকে, তারপর আশাভঙ্গের দুঃখে ফুলে-ফুলে উঠতে লাগলেন রাগে আর কান্নায়। বলতে লাগলেন, 'স্কাউণ্ড্রেল, রোগ্, দেখে নেবো, দেখে নেবো আমি একবার'—তাঁর গলা কেঁপে-কেঁপে ক্রমশই চড়তে লাগলো আর সবিতা চিঠিখানা নিয়ে আস্তে উঠে এলো নিজের ঘরে। সমস্তটা প'ড়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো খানিকক্ষণ। অনির্দেশ্য একটা করুণায় ভ'রে গেলো তার সমস্ত হৃদয়।

মনে পড়লো প্রতাপের মুখ। সে-মুখ চোখে দেখে তার অত সুন্দর মনে হয়নি কখনো, কিন্তু মনের মধ্যে যা অঙ্কিত আছে তার তো তুলনা নেই।

সবিতা জানে এ-বাড়ির দরজা চিরতরে বন্ধ হ'য়ে গেলো প্রতাপের জন্য। আবার কেউ আসবে।

চলবে অভিনয়; আবার নতুন ক'রে বালির বাঁধ, ভাবতেই অস্থির হ'য়ে উঠলো ওর শরীর-মন। চাই মুক্তি, মুক্তি চাই। ঐ অপরিসর চারটা দেয়ালে ঘেরা ঘরের মধ্যে যেন তার দম বন্ধ হ'য়ে আসতে লাগলো। একান্ত অশান্ত পায়ে পায়চারি করতে-করতে হঠাৎ একসময়ে নিঃশব্দ পায়ে দরজা খুলে নেমে এলো রাস্তায়।

দৈবাৎ

গ্রামের মধ্যে ঝুন্টি স্বনামধন্য। তাকে না চেনে এমন কে আছে? তেরো বছরের বাড়ন্ত মেয়ে, আঁটোসাঁটো গড়ন, সরল সুন্দর চোখ। কোমরে কাপড় জড়িয়ে কোঁকড়া কালো বাবড়ি চুল মেলে দিয়ে দিব্যি মনের আনন্দে সে ঘুরে বেড়ায় পাড়ায় পাড়ায়। ঘুড়ির দিনে ঘুড়ি ওড়ায়, সারাদিন লাট্টু ঘোরায়, মারবেল খেলে, কড়ি দিয়ে জুয়ো জেতে—আমগাছে আম, পেয়ারা গাছে পেয়ারা, কুলগাছে চ'ড়ে কুল—এমন কোনো দুরূহ কর্ম নেই যা সে করে না।

মা বাবা মারা গেছেন এইটুকু রেখে। নিঃসন্তান কাকা-কাকিমার নয়নের মণি। তাঁদেরই গভীর স্নেহচ্ছায়ায় তার এই সরল সদানন্দতা দিনের পর দিন অবাধ প্রশ্রয়ে বেড়ে উঠেছিলো। ঝুন্টির কাকা রথীবাবু মেয়ের এই দস্যিপনা এমন সস্নেহ হাসির সঙ্গে উপভোগ করতেন যে সেই সময় তাঁর মুখখানা দেখলে মনে হ'তো এর চেয়ে সুখ আর কোথাও তাঁর নেই। কিন্তু গ্রামে এ নিয়ে ভয়ানক আলোচনা হ'তে লাগলো। প্রথমে রেখে-ঢেকেই চলছিলো কিন্তু ক্রমে তা প্রকাশ্য শত্রুতায় দাঁড়ালো। একবার উষা এ নিয়ে

তাঁর স্বামীর মনোযোগ আকর্ষণ করবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে মেয়ের শাসনভার নিজের হাতেই গ্রহণ করলে। কাকির এই নিষ্ঠুরতায় ঝুন্টি প্রথমটা অবাক হ'লো বটে, কিন্তু ফল হ'লো না কিছুই।

গ্রামের জমিদার হরিশবাবু, তাঁরই ম্যানেজার ঝুন্টির কাকা। ঊষা এ নিয়ে জমিদারের কাছে নালিশ জানাতে বললো স্বামীকে। তাঁদের একটা হুঙ্কারেই হয়তো গ্রামবাসীর মস্তিষ্ক কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হবে। রথী চ'টে উঠলো—'বলছ কী তুমি—কী নিয়ে নালিশ জানাবো আমি? একটা পারিবারিক ব্যক্তিগত ঘটনা, তা নিয়ে আর হরিশবাবুর মাথা-ব্যথার অন্ত নেই, না? আর হরিশবাবু নিজেও এর চেয়ে কিছু কম যান কিনা।'

এর মধ্যেই একটা কাণ্ড ঘ'টে গেল। কাছারিতে যাবার মুখে রথীর একদিন দেখা হ'য়ে গেলো গ্রামের পাণ্ডা হরিহর ভটচাযের সঙ্গে। হাসিমুখে সম্ভাষণ জানিয়ে এগিয়ে গিয়েই রথী থমকে গেলো। ভটচায গম্ভীর মুখ ক'রে ব'লে উঠলেন, 'ছুঁয়ো না বাবাজি, জাত-জন্ম তো এখনো কিছু আছে।'

রথীকে অবাক হ'তে দেখে ভটচায বললেন, 'এটা কি তোমাদের উচিত হচ্ছে, রথী! অত বড় মেয়ে যে ছেলে

ছোকরাদের সঙ্গে অমন দামালি ক'রে বেড়ায় এতে তোমাদের একটুও লজ্জা করে না? সমাজকে কি তোমাদের একটুও ভয় নেই? আমি কাল নিজ চক্ষে দেখেছি ঐ নতুন লেখাপড়া-শেখা অযোধ্যা দাসের বড় ছেলেটার সঙ্গে সে আম-মাখা খাচ্ছে।'

'তাতে কী হয়েছে?'

'কী হয়েছে! অবাক করলে, রথী! ও মেয়ের কি জাতজন্ম আর বাকি আছে নাকি? তা বাপু ও-সব বিবিয়ানা তোমরা সমাজের বাইরে ব'সেই চালিয়ো। অযোধ্যা দাস আজই না-হয় চাকরি করে, দু' অক্ষর লিখতে শিখে ভদ্দর হয়েছে—চিরদিন তো মাছ ধ'রেই কাটলো। তার সঙ্গে এখনো আমরা প্রকাশ্যে ব'সে খাইনে।'

রথী একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'তা হ'লে আপনি কী করতে বলেন?'

'আমি আর বলবো কী বাপু—ঐ সতী-সাবিত্রী মেয়ের একটা গতি করো—আমার মেয়ে হ'লে তো আমি তার গলায় কলসি বেঁধে ডুবিয়ে দিতাম।'

'তা আমি জানি'—রথী চড়া সুরে বললে--'ডুবিয়ে কি কাউকে আপনি দেননি নাকি? ঐ একফোঁটা মেয়েকে

আপনি যদি স্বেচ্ছায় সত্তর বছরের বুড়োর হাতে দিতে পারেন টাকার লোভে, তবে তো আপনি সবই পারেন।' ঘৃণাভরে রথী পা বাড়ালো যাবার জন্যে।

হরিহর ভটচায এবার হুঙ্কার ছাড়লেন, 'বড়ই দেখছি আস্পর্ধা হয়েছে তোমার, রথী! কাকে কী বলছ ঠাহর নেই! এ-গ্রাম থেকে তোমাকে যদি উচ্ছেদ না করি তো আমার নাম হরিহর ভটচায নয়. আমার বাপের নাম নরহরি ভটচায নয়, আমার ঠাকুর্দার নাম হরচন্দ্র ভটচায—'

রথী আর না-শুনে হন্‌হন্ ক'রে চ'লে গেলো কাছারিতে। মনটা বড়ই খারাপ হ'য়ে গেলো।

বিকেলবেলা ফিরে এসেই রথী উষার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঝুন্টিকে দিনকয়েকের জন্য তার মামাবাড়ি ঢাকা রেখে আসা স্থির করলো। রথীর মতো সাদাসিধে মানুষ যে হরিহরের মতো ধূর্ত মানুষের সঙ্গে কিছুতেই এঁটে উঠতে পারবে না, এটা উষা ঠিক জানতো। বছর দুয়েক আগে একটা ঘটনা ঘটেছিলো রায়ের বাড়ি। রায়েদের সঙ্গে প্রায় পুরুষানুক্রমে ভটচাযদের শত্রুতা, কিন্তু তার রূপ যে এত বীভৎস, এত হৃদয়বিদারক হ'তে পারে এটা কেউ কল্পনা করতে পারেনি। সেটা যে এই হরিহরের দ্বারাই সাধিত—এ-কথা গ্রামের সবাই

ভানে। রায়েদের বড় ছেলে বরদা রায়ের একমাত্র মেয়েকে তিনদিন পরে অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রে পুবপাড়ার ধানখেতে যে-অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল তা স্মরণ ক'রে উষার হৃৎকম্প হ'তে লাগলো।

কাজে-কাজেই দুই চক্ষের জলে ভেসে পরের দিন সকাল-বেলা ছ'টার লঞ্চে যাবার জন্য মেয়েকে সে প্রস্তুত ক'রে দিলো। কিন্তু লঞ্চঘাটে যেতেই ঝুন্টি অবাক হ'য়ে বললে, 'কাকা, এখানে কেন এলে ?'

'ঢাকা যাবো যে তোকে নিয়ে।'

'ঢাকা ? কেন ?'

'তোর মামাবাড়ি। সেখানে তোকে রেখে আসবো—লেখাপড়া করবি, ভদ্রলোক হবি।'

'না, আমি যাবো না'—সজোরে ঝুন্টি হাত ছাড়িয়ে ঘুরে দাঁড়ালো।

'সে কী রে ?' রথী স্নেহভরে তাকে কাছে টেনে এনে বললে—'বেড়াতে যেতে তো তুই ভালোই বাসিস্—কী সুন্দর শহর—কত দোকান, কত খেলা—'

'হোক্‌গে, আমি যাবো না—ঝুন্টি প্রবলভাবে আপত্তি জানিয়ে শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

'রথী বেগতিক দেখে বললে, 'ও মা, বায়োস্কোপ দেখবিনে? সেইজন্যেই তো তোকে নিয়ে যাচ্ছি—এখানে আর কেউ ছাখেনি—'

ঝুন্টির শক্ত পা একটু নরম হ'লো—ন'ড়ে-চ'ড়ে বললে, 'তবে কাকিমাকে আনলে না কেন?'

'ওঃ, কাকি! কাকিকে নেবো কেন? সেবার যে যাত্রা হয়েছিলো তোকে নিয়েছিলো? ঘুম পাড়িয়ে রেখে কী রকম লুকিয়ে দেখে এলো।'

'হুঁ', ঝুন্টির পা চললো এবার—'ঠিক বলেছো, কাকামণি, খুব জব্দ হবে এবার।' ওর টানা চোখ খুশিতে ভ'রে গেলো।

বিনা ঝঞ্ঝাটে এবার ঝুন্টি লঞ্চে উঠলো। শ্রীপুর থেকে ঢাকা মোটে তিন ঘণ্টার রাস্তা—দেখতে-দেখতে এসে গেলো তারা।

নদীর কাছাকাছিই ওর মামাবাড়ি। মামা পোস্টমাস্টার। তার দুই মেয়ে সন্ধ্যা আর আরতি ঝুন্টিকে দেখে ভারি খুশি। ঝুন্টি তার কাকার শার্টের কোণ আঁকড়ে বিমর্ষমুখে দাঁড়িয়ে রইলো শক্ত হ'য়ে। মামিমা আদর করলেন, মামা টানলেন, কিন্তু তার মুঠি আলগা হ'লো না।

রাত বারোটায় একটা গহনার নৌকো ছাড়ে, ঝুন্টি ঘুমুলে রথী সেই নৌকোতে ফিরে এলো দেশে।

পরের দিন সকালে উঠে ঝুন্টি কাকাকে দেখতে না-পেয়ে বড়োই ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো, অবশেষে কাকার এই বিশ্বাস-ঘাতকতায় কাতর হ'য়ে কাঁদতে লাগলো। কিন্তু একদিন গেলো, দু'দিন গেলো, এই ক'রে-ক'রে অনেকদিন পরেও যখন কাকা আর এলেন না তখন সে একেবারে শান্ত হ'য়ে গেলো। সেই গণ্ডি-ঘেরা ছোট্ট বাড়ি—হুকুম নেই বাইরে আসবার। রাস্তায় ঢাকাই মুসলমান ছেলেমেয়েরা খেলা করে—গান গেয়ে চ'লে যায়—'বো কাট্টা' ঘুড়ি ওড়ায় আর আনন্দধ্বনি করে, জানালায় ব'সে তা দেখে-দেখে ঝুন্টির শিক ভেঙে বেরিয়ে আসতে ইচ্ছে করে। সূর্যালোক যেন নিবে গেছে তার জীবন থেকে। বিকেলবেলা মামাতো বোনেরা নিজেরা সাজে, মুখে পাউডর দেয়, চোখে কাজল মাখে, কপালে দেয় কুমকুমের ফোঁটা—ঘুরিয়ে সুন্দর রঙের শাড়ি পরে, তারপর জুতো পায়ে দিয়ে তাকে নিয়ে বেড়াতে যায় নদীর ধারে। যেখান থেকে সব গহনার নৌকো ছাড়ে, লঞ্চ ছাড়ে, সে-সব দেখায়—দেখিয়ে-দেখিয়ে বলে, 'ঝুন্টি, যাবে নাকি? ঐ গ্যাখো শ্রীপুরের গহনা—ঐ গ্যাখো লঞ্চটা ছাড়ছে।' ঝুন্টি শব্দ করে না—মন কেমন ক'রে ওঠে—গলা বন্ধ হ'য়ে আসে।

একদিন দুপুরবেলা মেয়েরা ইস্কুলে গেছে, মামা আপিশে,

মাসিমা ঘুমুচ্ছেন নাক ডাকিয়ে। এ-জানালা ও-জানালা ক'রে ক'রে হঠাৎ ঝুন্টির কী দুর্বুদ্ধি হ'লো, নিঃশব্দে এক সময় দরজা খুলে বেরিয়ে এলো রাস্তায়—এদিক-ওদিক তাকিয়ে তারপর সোজা একেবারে গহনাঘাটে।

একখানা গহনা ঘাটে বাঁধা ছিল—গা ঢাকা দিয়ে আস্তে-আস্তে সে উঠে এলো নৌকোতে। মাঝিরা সব খেতে গেছে পাড়ে। পেছনের গলুইতে কর্ণধার হ'য়ে বছর দশেকের এক ছোকরা বসেছিলো, সে দেখতে পেয়ে ব'লে উঠলো—'এই, তুমি কেন নৌকোয় চড়ছো?'

'আমি যাবো।'

'ঈস, গেলেই হ'লো! পয়সা আছে?'

'বাড়ি গিয়ে দেবো।'

'দিয়ো কিন্তু'—খুব চালের মাথায় ছোকরা একবার জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে গম্ভীর মুখে গান ধরলো, 'নইদের চাঁদ কুম্ভীর হইয়েছে।'—আর ঝুন্টি সেই সুযোগে মাঝিদের টাল করা বিছানা বোঁচকা ঠেলে তার পিছনে গিয়ে লুকিয়ে রইলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলো মাঝিরা—আস্তে লোকজনে ভ'রে উঠলো নৌকো—ভিড় বেশি হ'লো না—যদি বা কেউ আসে এই ভরসায় নৌকো খানিক দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর

নৌকো যখন প্রায় ছাড়ে তখন একুশ-বাইশ বছরের চশমা-পরা সুন্দর একটি ছেলে লাফ দিয়ে উঠে এলো নৌকোয় এবং ছইয়ের তলায় না-ব'সে একেবারে পিছনের দিকে যেখানে মাঝিদের বোঁচ্‌কা পুঁটুলি রাখা আছে সেখানে পিঠ ক'রে বসলো—ঝুন্টির একেবারে ঠিক নাকের সামনে। এতক্ষণ ঝুন্টির লুকিয়ে এ-সব দেখতে ভারি মজা লাগছিলো। মনটা যেন ছাড়া পেয়েছে এতদিন পরে, কিন্তু বাক্স-বিছানার একটু-আধটু ছিদ্রপথে যে-আলোটুকু হাওয়াটুকু তার জুটছিলো ঐ ছেলেটির পিঠের অন্তরালে তা থেকে বঞ্চিত হ'য়ে ঝুন্টি ভয়ানক অসন্তুষ্ট হ'লো। প্রতি মুহূর্তে পাংলা পাঞ্জাবি ভেদ ক'রে প্রচণ্ড এক চিমটি কাটার ইচ্ছা হ'তে লাগলো তার। তার উপর নৌকো ছাড়তেই ছেলেটা একটা সিগারেট ধরিয়ে আরাম ক'রে টানতে লাগলো আর যত ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ঢুকতে লাগলো ঝুন্টির নাকে। ঝুন্টি অনেকক্ষণ এই অন্যায় সহ্য করলো তারপর মরীয়া হয়ে সে মুখ বাড়ালো বাক্স বিছানা ঠেলে। গরমে সেদ্ধ হয়েছে এতক্ষণ—টুকটুক করছে গাল—বিন্দু-বিন্দু ঘামে ভরা কপাল। হঠাৎ ছেলেটি চমকে মুখ ফিরিয়ে অবাক হ'য়ে গেলো। চোখ লাল ক'রে ঝুন্টি বললে, 'এই, সিগারেট খাচ্ছো কেন?'

ছেলেটি ভয়ানক কৌতুক বোধ করলো। বললে, 'তাতে তোমার কী ?'

'আমার বমি আসছে, এক্ষুনি ফেলো সিগারেট।'

একান্ত বাধ্য ছাত্রের মতো সে হাতের অর্ধদগ্ধ সিগারেট জলে ফেলে বললে, 'এই ছ্যাখো আমি কেমন তোমার কথা শুনলাম, তুমিও এখন নিশ্চয়ই আমার কথা শুনবে।'

ঝুন্টি জবাব না-দিয়ে আবার মাথা ডোবালো কাঁথার পিছনে।

'এ কী ?'

'বাঃ, মেয়েদের আবার গহনায় চড়তে আছে নাকি ?'

'তবে চড়েছো কেন ?'

'তাই জন্যেই তো লুকিয়ে আছি।'

'লুকিয়ে তো তুমি শেষ পর্যন্ত থাকবে না—এক জায়গায় তো নামবেই ?'

'তাও তো বটে'—ঝুন্টি এবার ভাবলো কথাটা। চিন্তিত-ভাবে বললে, 'তাহ'লে কী করি বলো তো ?'

'আমি তো বলি তুমি বেরিয়ে এসে এইখানে আমার পাশে বোসো---সুন্দর হাওয়া আর কেমন পড়ন্ত রোদ—'

ঝুন্টি মুহূর্তে বোঁচকা পুঁটুলি ঠেলে সবেগে বেরিয়ে

এলো বাইরে। সঙ্গে-সঙ্গে মাঝি-মাল্লা যাত্রীরা সবাই স্তম্ভিত হ'য়ে একযোগে তাকালো ওর দিকে। হেড মাঝি একটু ভালোমানুষ গোছের, জিজ্ঞেস করলো 'তুমি কে গো দিদি?'

'আমি ঝুন্টি'—সহজ সরল গলায় ঝুন্টি বললো।

'তুমি একা এসেছো নাকি? কোথা থেকে এসেছ? নামবে কোথায়?'

'নামবো শ্রীপুরে, কিন্তু কোথা থেকে এলাম তা আমি বলবো না।'

মাঝি হাসলো। 'লুকিয়ে এসেছো বুঝি?'—যাত্রীদের মধ্যে একজন রসিকতা ক'রে উঠলো 'বাঃ, বেড়ে মেয়ে তো।'

হঠাৎ ছেলেটি চীৎকার ক'রে উঠলো, 'চোপরাও রাস্কেল! আর একটি কথা বলবে তো মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেলবো।'

জনতার মধ্য থেকে ঝাঁকড়া চুলওয়ালা ঘাড় লিকলিকে এক ছোকরা রুখে উঠলো—'তুমি কে হে—এটি কি একা তোমার সম্পত্তি?'

'ফের, বদমাস্!'—এবার ছেলেটি আস্তিন গুটিয়ে উঠে দাঁড়ালো আর সঙ্গে-সঙ্গে কে একজন বৃদ্ধ ফিসফিসিয়ে ব'লে উঠলো, 'ওরে, করছিস কী তোরা—ও যে আমাদের বড়ো-

বাবুর ছেলে অরুণ।'

'সর্বনাশ'—লিকলিকে ঘাড়ওয়ালা জিভ কেটে ব'সে পড়লো তক্ষুনি। মাঝি-মাল্লারাও একবার সচকিত হ'লো। মুহূর্তে মন্ত্রাবিষ্টের মতো শান্ত হ'য়ে গেলো সকলের স্বর। হরিশবাবুর কোপে পড়ার চেয়ে যে-কোনোরকম দুঃখই তারা বরণ করতে পারে। আর এই গহনার নৌকো যে শ্রীপুরের খাল বেয়ে চলতে পারে সে তো তাঁরই দয়ায়—প্রায় বারো আনা পথই যে তাঁদের এলাকা। হুমকি ছেড়ে মাঝি বললো, 'যাত্রী ভাই, তোমরা সব ভদ্দরলোক না? ভদ্দর-লোকের কি এই ব্যাভার?' তারপর একান্ত বিগলিতভাবে বড়োবাবুর পুত্রের কাছে তারা মার্জনা ভিক্ষা করলো।

কিন্তু এত সব কাণ্ড যাকে নিয়ে সে দিব্যি নিরুদ্বেগে অরুণের পাশে এসে বসলো। বিষণ্ণমুখে বললো, 'বাড়ি গেলে আমাকে বোধ হয় কাকি বকবে। কিন্তু ওখানে থাকার চেয়ে কাকির একটু বকুনি খাওয়া অনেক ভালো।'

'কোথায় ছিলে তুমি?'

'ঐ তো বড় পোস্টাপিশের কাছে, আমার মামাকে চেনো না? তারই তো পোস্টাপিশ।'

অরুণ হেসে ফেলল, 'ও, তাই নাকি?'

'হুঁ,' খুব গম্ভীরভাবে ঝুন্টি জবাব দিলো।

'তোমার নাম বুঝি ঝুন্টু?'

'না, ঝুন্টি—ঝুন্টু কেবল কাকিমার জন্য।'

'আমার জন্যে না?'

ঝুন্টি এবার চোখ বড় ক'রে তাকালো ওর মুখের দিকে। হঠাৎ ভয়ানক ভালো লাগলো তার সে-মুখ। তাকিয়ে রইলো।

'কী দেখছো?'—অরুণ হেসে বললো।

লজ্জিতভাবে ঝুন্টু চোখ নামিয়ে বললে, 'তুমি যদি নেহাৎই চাও তবে ডাকতে পারো ঝুন্টু ব'লে।'

'তাহ'লে আমাকে নিশ্চয়ই তোমার পছন্দ হয়েছে?'

ঝুন্টি সে-কথার জবাব না-দিয়ে বললে, 'আর আমি তোমাকে কী ব'লে ডাকবো?'

'অরুণ।'

'অরুণ! কিন্তু তুমি যে আমার বড়। কাকি বলেন যে বড়দের নাম নিয়ে ডাকতে নেই।'

'তাহ'লে ডেকো না।'

'বাঃ, তা কী হয়? কিছু তো একটা ডাকতেই হবে।'

'তা কেন, না-ডেকেও বেশ কথা বলা যায়।'

'কক্ষনো যায় না'—ঝুন্টি সবেগে প্রতিবাদ করলো।

'নিশ্চয়ই যায়'—অরুণ গলার স্বর যথাসম্ভব নিচু ক'রে বললে, 'তোমার মা কি তোমার বাবাকে কিছু ব'লে ডাকেন?'

'আমার বাবা নেই, কাকা আছেন—'

'তাহ'লে তোমার কাকিমা তাঁকে কী ব'লে ডাকেন জানো?'

'ধ্যেৎ—' ঝুন্টির গালে হঠাৎ রক্ত নেমে এলো।

লজ্জা সে জীবনে পায়নি। বিয়ের সম্বন্ধ তার বহু এসেছে, কাকি ব'লে দিয়েছেন, এটা লজ্জার বিষয়—এ-কথা কাউকে বলতে নেই—তাই সে বলে না, কিন্তু এ-লজ্জা তার কোথায় লুকিয়ে ছিলো? কাকা কাকিমার সম্বন্ধটা ঠিক যে অন্যান্য সম্পর্কের বাইরে এটা সে বুঝেছিলো—মেনেও নিয়েছিলো, কিন্তু একজন মানুষের সঙ্গে তারও ঠিক সেই সম্বন্ধ হওয়া যে কেমন, তার একটা অস্পষ্ট অনুভূতি তার অপরিণত বালিকাচিত্তে হঠাৎ একটা নাড়া দিলো। চুপ ক'রে ব'সে রইলো জলের দিকে তাকিয়ে।

একটু পরে অরুণ বললে, 'কী হ'লো? রাগ নাকি?'

'তুমি ও-রকম যা-তা বলো কেন?'

'যা-তা কী—এমনও তো হ'তে পারে যে, তোমার

কাকিমার সঙ্গে তোমার কাকার যা সম্পর্ক, আমার সঙ্গেও তোমার সেই সম্পর্ক হ'লো।'

ঝুন্টিকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে অরুণ বললে, 'আমার কথা তুমি বোঝোনি?'

'বুঝেছি।'

'কী বুঝেছো?'

'বলবো না।'

'বলো না!'

'না।'

'বলো না লক্ষ্মীটি—' অরুণ ঝুন্টির হাতের উপর নিজের হাত রাখলো।

ঝুন্টি হঠাৎ এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, 'বিয়ে আমি করবোই না কোনোদিন।'

'আমাকেও না?'

'না।'

'তাহ'লে তো ভারি মুশকিল দেখছি।' দুষ্টু হাসিতে অরুণের সুন্দর মুখ ঝলমল ক'রে উঠলো, আর ঝুন্টি দারুণ বিচক্ষণের মত ব'সে-ব'সে চিন্তা করতে লাগলো, বিয়েতে অনুমতি দেবে কিনা, এই বোধ হয় তার সমস্যা। খানিক

পরে ভয়ানক দুঃখের সুরে বললে, 'গ্যাখো, কাকা আমাকে বায়োস্কোপ দেখাবেন ব'লে ঢাকা নিয়ে এলেন, তা তো দেখালেনই না, এদিকে মামাবাড়িতে ফেলে রেখে পালিয়ে গেলেন। মন টেঁকে আমার? তুমিই বলো—না পারি বাইরে বেরুতে, না পারি দৌড়তে—না ঘুড়ি, না লাট্টু—ওখানে আমাদের শ্রীপুরে আমি কত সুখে ছিলাম। সারাদিন ঘুরে বেড়িয়েছি, কাঁচা আম খেয়েছি, কড়ি খেলেছি; আর এখানে কী বলবো তোমাকে, আমি ম'রে যেতুম আর দু'দিন থাকলে। দুপুরবেলা মামা থাকেন আপিশে, সন্ধ্যা আর আরতি-দি তো ইস্কুলেই যায়; এক মামিমা আর আমি—মামিমা ঘুমুতেই দোর খুলে বেরিয়ে এসেছি। ভালো করিনি?'

'নিশ্চয়ই! তা নইলে আমি কি পেতাম তোমাকে?'

'সেই তো!' ঝুন্টি সায় পেয়ে একেবারে গ'লে গেলো। একটুখন চুপ থেকে আবার বললে, আচ্ছা, তুমি সাঁতার জানো?'

'নিশ্চয়ই।'

'ক' রকম জান?'

'আমি? আমি ডুব-সাঁতার জানি, মরা ভাসতে জানি, চিৎসাঁতার জানি। শিখিয়েও দিতে পারি তোমাকে।'

'তা আর কী ক'রে হবে বলো।' ভারি এক দুঃখের ভঙ্গী ক'রে অরুণ বললে, 'তুমি তো মোটে আমার কথায় রাজিই হ'লে না, তা নইলে কী মজাটাই যে হ'তো, আমি তোমাকে যত খুশি ছবি দেখাতুম, আর তুমি আমাকে সাঁতার শেখাতে।'

অবাক হ'য়ে ভুরু কুঁচকে ঝুন্টি বললে, 'কী আবার রাজি হলাম না!'—ব'লে তক্ষুনি কী কথা মনে হ'লো আর সঙ্গে-সঙ্গে সাংঘাতিক জোরে অরুণের হাতের উপর এক চিমটি কাটলো সে।

অরুণ উহুঁ ব'লে হাত বুলুতে লাগলো সে-জায়গায়, আর ঝুন্টি মুখ ফিরিয়ে বসলো তার উল্টো দিকে।

সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ। এদের গুনগুন কথায় ঈর্ষাকাতর যাত্রীরা অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছে, কেউ বসেছে গিয়ে ছইয়ের উপরে—কেউ বা মশা চাপড়াচ্ছে অধীরভাবে।

কৃষ্ণপক্ষ। সাংঘাতিক অন্ধকার। মাঝিরা একটা কালি-পড়া লণ্ঠন জ্বালিয়ে রাখলো অরুণের মুখের সামনে।

একটু পরে অরুণ বললে, 'ও মাঝি, লণ্ঠন জ্বেলেছো কেন, খামকাই তোমার তেল খরচা হচ্ছে।'

'কর্তা নাকি অন্ধকারে রইবেন।'

'অন্ধকার ভালো হে, এ-আলো তুমি সরাও মুখের কাছ থেকে।'

মাল্লা হাঁকলো, 'ও মাঝি ভাই, লণ্ঠন নি কারো দরকার আছে, জিগাও তো', তারপর উত্তরের অপেক্ষা না-ক'রে লণ্ঠনটা যথাসম্ভব কমিয়ে এক কোণে রেখে দিলো।

আলো সরলে অরুণ ঝুন্টির হাত ছুঁয়ে বলল, 'ঘুমুবে?'

'হুঁ।' মাঝিদের তোরঙ্গে ইতিমধ্যেই সে মাথা এলিয়ে দিয়েছিলো।

অরুণ নিজের স্যুটকেস খুলে খান দুই ধুতি আর পাঞ্জাবি বার ক'রে একটা তোয়ালে জড়িয়ে বালিশের মতো পাকিয়ে নিজে যথাসম্ভব কুঞ্চিত হ'য়ে ব'সে বললে, 'এই যে এখানে শোও—ওখানে মাথা রেখো না, ভারি ময়লা।'

ঝুন্টি ভদ্রতা জানে না—ভূমিকা না-ক'রে হাত-পা ছড়িয়ে শুলো, তারপর বললো, 'দ্যাখো, কাকি বলেন, আমার মাথায় নাকি যত রাজ্যের নোংরা তাই জন্যে কারো বালিশে আমাকে মাথা রাখতেই দেন না। তা তোমার তো এ-সব পরবার কাপড়—'

অরুণ হেসে ফেলল,—'তোমার কাকি তো ভারি দুষ্টু, এমন সুন্দর পশমের মতো চুলে নাকি আবার ময়লা থাকে। কই, দেখি'—অরুণ ভয়ানক বেশিরকম নিচু হ'য়ে অন্ধকারে চুলের ময়লা পরীক্ষা করতে লাগলো হাত বুলিয়ে-বুলিয়ে। আর ঝুন্টি আরামে গভীর ঘুমে অচেতন হ'য়ে পড়লো।

রাত প্রায় সাড়ে আটটায় গহনা এসে পৌঁছলো শ্রীপুরে—ত্রস্তে ঠেলা দিয়ে তুললো সে ঝুন্টিকে, তারপর বোসের ঘাটে নৌকো রাখতে ব'লে নেমে পড়লো ঝুন্টির হাত ধ'রে।

বোসের ঘাট থেকে বড় জোর মিনিট তিনেকের পথ ঝুন্টিদের বাড়ি। মাঝে একটা সাঁকো পার হ'তে হয়। গ্রাম এর মধ্যেই নিশুতি হ'য়ে গেছে। ঝুন্টির অন্ধকারকে ভারি ভয়। এত রাত্রে সে বাইরে বেরিয়েছে, এ অভিজ্ঞতা তার এই প্রথম, ভয়ে সে অরুণের হাত আঁকড়ে রইলো।

'ভয় করছে?'

'হুঁ।'

'যদি আমি না আসতাম কী হ'তো ?'

'রাম-লক্ষ্মণ-সীতা বলতুম।'

'তাহ'লে বুঝি ভয় থাকে না।'

'উহুঁ।'

'তা এখন বলো না।'

'তুমি তো আছো।'

'আমি চ'লে যাই।'

'ইস্!'

'ইস্ কী, তুমি কি ভেবেছ আমি তোমার সঙ্গে তোমাদের বাড়ি পর্যন্ত যাবো ?'

'যাবেই তো।'

অরুণ অন্ধকারে টর্চ জ্বালিয়ে পথ দেখতে-দেখতে আসছিলো—ওর কথা শুনে বাঁ হাতে ওকে কাছে জড়িয়ে এনে বললো, 'ভারি তো আহ্লাদি'—তারপর টর্চ নিবিয়ে দিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে প'ড়ে বললে, 'তুমি তো রথীবাবুর বাড়ি যাবে, ঐ তো তোমাদের বাড়ি দেখা যাচ্ছে, তোমাকে বাড়ির কাছে দিয়েই আমি চ'লে যাবো।'

'তোমাকে দেবোই না যেতে।'

অরুণ হাসলো। বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াতেই ঝুন্টি

অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে দরজা ধাক্কাতে লাগলো, 'কাকি, দোর খোলো—আমি ঝুন্টি—'

ঝপ্ ক'রে দরজা খুলে গেলো—আর বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো ঝুন্টি কাকির বুকের উপর। অভিমানে সে কেঁদে ফেললো।

রথী তার মনিবপুত্রকে দেখে থ হ'য়ে রইলো খানিকক্ষণ। অরুণ বললো, 'ইনি একাই আসছিলেন—আমাদের দেশ-বাসীরা তেমন ভদ্র নয় তাই আমাকে রাস্তায় এঁর ভার নিতে হল। আচ্ছা, আজ আসি।' পা বাড়াতেই রথী অত্যন্ত কৃতজ্ঞভাবে ওর দু'হাত জড়িয়ে ধরলো, কথা বলতে পারলে না। ব্যাপারটা তার বোধগম্য হয়েছিলো সঙ্গে-সঙ্গেই।

হরিশবাবুর একমাত্র পুত্র এই অরুণকুমার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন। একুশ বছর বয়েস। এম. এ. পড়ছে। বাপের স্নেহের অন্ত নেই এই সন্তানের প্রতি—মুক্ত হস্তে তিনি টাকা খরচ করেন মনের আনন্দে। গ্রীষ্মের ছুটিতে তার আসবার কথা—মা বাবা পথ চেয়ে দিন গুনছেন। পথ চলতে-চলতে অরুণের মাথায় অনেক চিন্তা

ভিড় ক'রে এলো। কথা ছিলো আসবার আগে টেলিগ্রাম ক'রে আসবে। প্রতিবারই তার মা বাবা এ-কথা লেখেন, প্রতিবারই সে এর ব্যতিক্রম ক'রে থাকে কেননা সে আসছে এই যে একটা ঢাক ঢোল আর বিশেষ ব্যবস্থা এটা তার বড়ই খারাপ লাগে। ঢাকা এসেছে সে তিন দিন আগে বন্ধুর বাড়ি। এর আগে কখনো এমন জনগণে মিশে সে গহনার নৌকোর যাত্রী হ'য়ে আসেনি—এবার নেহাৎই একটা শখে সে উঠে এসেছিলো। কিন্তু যোগাযোগের কথাটা ভেবে অরুণের তরুণ হৃদয় আবেশে মুগ্ধ হ'য়ে গেলো।

বাড়ি পৌঁছতেই মা-বাবা অবাক হ'য়ে গেলেন। ভর্ৎসনা করলেন খবর না-দিয়ে আসবার জন্য। অরুণ হাসিমুখে অপরাধ স্বীকার ক'রে মাকে আদর করলো। কথাবার্তায় খেতে-টেতে অনেক রাত হ'য়ে গেলো—শুতে যখন গেলো তখন রাত প্রায় বারোটা। কিন্তু শুতে গিয়ে অরুণের আর ঘুম এলো না। কী এক মধুরতায় সমস্ত মন আচ্ছন্ন হ'য়ে রইলো।

পরদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙতে তার অনেক দেরি হ'য়ে গেলো। রোদ বেশ চ'ড়ে উঠেছে—চা খাচ্ছিলো ব'সে এমন সময় পুজো সেরে মা এলেন ঘরে—'হ্যাঁরে অরু, এ-সব কী

শুনছি? কালকে নাকি তুই গহনার নৌকোয় ম্যানেজার-বাবুর ভাইঝিকে নিয়ে এসেছিস? সকালবেলা উঠে তো আর কান পাততে পারছিনে।'

'কেন বলো তো?'

'যা-তা বলছে লোকেরা। মেয়েটাও বাবা যা হয়েছে!'

'কেন, মেয়েটা তো বেশ ভালোই।'

'তুই বলিস ভালো? ও দস্যি মেয়ে কখনো ভালো হয়?' অরুণ হাসলো। মা বললেন, 'মেয়েটাকে আমি দেখেছি একবার—দেখতে কিন্তু ভারি মিষ্টি। কিন্তু মা-বাপ নেই—শাসন নেই, একেবারে বুনো র'য়ে গেছে।'

'তুমি এনে মানুষ করো না '

'মরণ দশা! শুনেছি ম্যানেজারবাবুর স্ত্রীর নাকি ও নয়নের মণি, তাই জন্যেই তো আহ্লাদে-আহ্লাদে' অমন হয়েছে।'

'তবে তো একটু শাসন দরকার। আমি তো ভাবছি তার ভারটা তোমাকেই নিতে বলবো।'

চকিতে মা চোখ তুলে তাকালেন ছেলের দিকে।

একটু পরেই প্রসঙ্গ পরিবর্তন ক'রে বললেন, 'খোকা,

আমি ভাবছি এবার তোকে যেমন ক'রে পারি বিয়ে করাবোই, আর তোর অমত শুনবো না।'

'ভালোই তো।' অরুণ হাসলো।

'তবে তুই বিয়েতে রাজি হচ্ছিস? মেয়ে দেখবি?'

'মেয়ে তো দেখেছি।'

'কাকে দেখেছিস?'

'কেন, সেই দস্যি মেয়েকে—যাকে শাসন করবার ভার নেবে তুমি।'

মা খানিকক্ষণ কথা বললেন না—ভালো ক'রে ছেলেকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে। তাঁর ছেলের মন! সে-মন যা গ্রহণ করে তাতে তাঁর বিশ্বাস ছিলো।

সেদিনই বিকেলবেলা তিনি দাসীকে দিয়ে খবর পাঠালেন; কাছারিতে ম্যানেজার যেন যাবার আগে অবশ্য তাঁর সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যান।

রথী ব্যস্ত হ'য়ে তক্ষুনি উঠে দাঁড়ালো। বুক কাঁপতে লাগল তার। সে জানে যে সামাজিক অপরাধে তার কন্যা অপরাধী, এর শাস্তি অবধারিত। কাছারিতে আসতেই আজ তার ভয় করছিলো কিন্তু ভাগ্যক্রমে হরিশবাবু আজ বিশেষ প্রয়োজনে গ্রামান্তরে গেছেন, রাত্রের আগে ফিরবেন

না, কিন্তু অন্দর থেকেও যে আগুন জ্ব'লে উঠবে এটা সে ভাবেনি। মনে-মনে নিজের স্বপক্ষে সে জবাব ঠিক করতে-করতে কুণ্ঠিত পদে দাসীর সঙ্গে অন্দরে এসে দাঁড়ালো।

ঘরের দরজার কাছে আসতেই অরুণের মা মাথার কাপড় ঈষৎ টেনে দিলেন। মৃদুস্বরে বললেন, 'আসুন ভিতরে।'

রথী ভিতরে এসে বসতেই তিনি দাসীকে ইঙ্গিত করলেন। দাসী স'রে গেলে বললেন, 'ম্যানেজারবাবু, বিশেষ প্রয়োজনেই আপনাকে ডেকেছি। শুনেছি আপনার একটি পিতৃমাতৃহারা ভাইঝি আছে, তাকে নিয়ে পাড়ায় নানারকম জনরবও শুনি,—মেয়েটিকে আমি একবার দেখতে চাই।'

'অবশ্যই নিয়ে আসবো।' রথী বিনয়ে লজ্জায় হাতে হাত ঘষতে লাগলো, তারপর একটু সামলে নিয়ে বললে, 'আপনি হয়তো কালকের ঘটনা শুনেছেন, অরুণবাবুর দয়ায় আমার মেয়ে আমি ফিরিয়ে পেয়েছি—সে-ঋণ আমি সমস্ত জীবন শোধ করতে পারবো না।'

'হ্যাঁ, আমি শুনেছি সে-কথা, আপনি পারলে আজকেই একবার নিয়ে আসবেন তাকে।'

'অবশ্যই—আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য।'

রথী নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিয়ে বাড়ি এলো। বাড়ি এসে দেখলো উষা ট্রাঙ্ক গোছাচ্ছে, আর ঝুন্টি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখছে। রথী উৎফুল্ল মুখে এসে বললো, 'উষা, ব্যাপার কী বুঝলাম না—জমিদারগিন্নি একবার ঝুন্টিকে দেখতে চেয়েছেন। সুন্দর ক'রে সাজিয়ে দাও তো, আমি চা খেয়েই নিয়ে যাবো।'

উষা বিমর্ষমুখে বললো, 'ছাখো, আজকে আমাদের খাবার জল রিজার্ভ ট্যাঙ্ক থেকে আনতে দেয়নি—ও-জল আমরা ছুঁতে পারবো না—আমি তো কালই চ'লে যাচ্ছি ঝুন্টিকে নিয়ে, কিন্তু তোমাকে ওরা কী করবে কে জানে।'

'তুমি কিছু ভেবো না—তোমাদের তোমার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে আমি একবার এদের দেখে নেবো। তুমি চট্‌পট্ ওঠো তো।'

বাক্‌সের ডালা বন্ধ ক'রে উষা উঠে পড়লো।

ঝুন্টিকে নিয়ে বেরুতে-বেরুতে সন্ধ্যা লেগে গেলো। জমিদার বাড়ির দেউড়িতে ঢুকতেই দেখা হ'য়ে গেলো অরুণের সঙ্গে, 'আরে, আপনারা যে—' অরুণ বিস্মিত হ'য়ে গেলো। আড়চোখে তাকালো ঝুন্টির দিকে—রথী বললো, বেরুচ্ছেন নাকি? আপনার মা একবার আসতে বলেছিলেন।'

অরুণ ঠোঁট কামড়ালো এবার। মা-কে সে জানে। বললো, 'না, এই একটু ঘোরাঘুরি করছিলাম—চলুন আপনারা।'

তাদের বসিয়ে অরুণ তার মা-কে ডেকে নিয়ে এলো। মা এসেই হাত বাড়ালেন ঝুন্টির দিকে, 'এসো তো মা।'

কাকার শিক্ষামতো ঝুন্টি এগিয়ে গেলো কাছে—প্রণামও করলো লক্ষ্মী মেয়ের মতো। মা বললেন, 'ও মা, এ তো দেখছি বেশ লক্ষ্মী মেয়ে—এসো তো আমার সঙ্গে একটু'—অরুণের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অরুণ, তুমি একটু কথা বলো ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে, আমি আসছি।'

অরুণ বুঝলো, মা এবার নাড়ি-টেপা ডাক্তারি করবেন। ছেলের পছন্দের যাচাই আরকি। মনে-মনে প্রার্থনা করলো, পরীক্ষায় যেন ঝুন্টি উত্তীর্ণ হয়। মা-কে জয় করাই সব। বাবা যে অন্দরে একান্তই মা-র ছায়া এ-কথা সে জানে।

ঝুন্টিকে নিয়ে অনেকক্ষণ পরে মা ফিরে এলেন প্রফুল্ল-মুখে —তারপরে এলো খাবার—এবং আদর-আপ্যায়নে রথীকে অভিভূত ক'রে ফেলে অবশেষে বললেন, 'ম্যানেজার বাবু, আমার ছেলেটির কাছে তো আপনি ঋণী—ঋণ শোধ করবার একটা উপায় আছে—আপনার মেয়েটি আমাদের দিন।'

'সে কী!' রথী প্রথমটা বুঝতেই পারলো না কথাটা। বিস্ময়ে আনন্দে স্তব্ধ হ'য়ে তাকিয়ে রইলো অরুণের মা-র দিকে।

অরুণের মা বললেন, 'বেশ মেয়ে আপনার, আমার তো মেয়ে নেই—আপনারও ছেলে নেই'—অরুণের মা অত্যন্ত সহজভাবে বললেন।

অরুণ মা-র ঔদার্যে মুগ্ধ হ'য়ে গেলো।

ইতিমধ্যে একটা কাণ্ড ঘ'টে গেলো। অরুণের মা-র একটা বেজি ছিল—কোথা থেকে সেটা ছাড়া পেয়ে পিল্-পিল্ ক'রে এসে লাফ দিয়ে উঠলো গিন্নির কোলে, আর মুহূর্তে ঝুন্টি কাকা-কাকিমার সমস্ত শিক্ষা ভুলে আনন্দে হাততালি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো ওটা ধরবার জন্যে—বেজিটা ভয় পেয়ে তক্ষুনি নেমে ছুটলো ভিতরের দিকে; সঙ্গে-সঙ্গে ঝুন্টিও বিদ্যুৎবেগে ছুটলো তার পিছন-পিছন। রথীর মুখে দুর্ভাবনার ছায়া নামলো, আর অরুণের মা-র মুখ ভ'রে গেলো আনন্দে। এই দাপাদাপি তিনি কতকাল ভুলে আছেন। ছেলে তাঁর অকালপক্ক—মনেই পড়ে না কবে সে এমন ক'রে শেষ ছুটোপুটি করেছিলো—সস্নেহে বললেন 'পাগলি!'

অরুণ এবার লজ্জা ত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়ালো, 'আমি দেখিগে মা, ওটা আবার কামড়ে না দেয়।'

ঘরে ঢুকেই সে ছুটন্ত ঝুন্টিকে খপ্‌ ক'রে ধ'রে ফেললে, সঙ্গে-সঙ্গে ঝুন্টি একহাত জিব বের ক'রে ভয়ানক অপরাধীর মতো বললে, 'এ মা, কী হবে?'

'কী হ'লো?'

'একদম ভুলে গিয়েছিলাম। কাকি ব'লে দিয়েছেন এখানে এসে লজ্জা করতে—'

'কী আর হবে—কিন্তু আমাদের পুকুর দেখেছো? এবার আমাকে সাঁতার শেখাবে তো?'

'ধ্যেৎ!' ঝুন্টি মুহূর্তে লাল হ'য়ে উঠলো।

'শোনো'—অরুণ ওকে হাত ধ'রে টেনে যথাসম্ভব কাছে এনে বললে 'তুমি খুশি হয়েছো? না, বলো, বলতে ইহবে—' ঝুন্টির সলজ্জ মুখ সে তুলে ধরলো।

ও-ঘর থেকে মা ডাকলেন, 'ওরে তোরা করছিস্ কী? ম্যানেজারবাবু এখন যাবেন।'

পরিশোধ

মাধুরীকে দেখে হঠাৎ অরবিন্দ থমকে গেলো। দেখলো বোধ হয় আট বছর পরে, কিন্তু চিনতে তার এক পলকের বেশি প্রয়োজন হ'লো না। মাথাটা যথাসম্ভব নিচু ক'রে সে যেন নিজেকে একটু আড়াল করবার চেষ্টা করলো।

বিয়ে বাড়ি। প্রকাণ্ড চকমিলানো দালানের চৌকো উঠোনে শামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। ঝলমল করছে আলোতে। মাঝখানে হাত তিনেক ফাঁক রেখে লম্বালম্বি টেবিল আর ভেনেস্তা চেয়ার ফেলে দুদিকে খাবার ব্যবস্থা, একদিকে মেয়েরা, একদিকে পুরুষেরা। অরবিন্দর অনেকক্ষণ থেকেই মনে হয়েছে যে যে-মেয়েটি তার দিকে পিছন ফিরে খেতে বসেছে তার হাতির দাঁতের মতো শুভ্র মসৃণ ঘাড়ের উপরকার ঢেউ-খেলানো চুলের অবিন্যস্ত ঢিলে খোঁপাটি সে যেন চেনে। হঠাৎ মেয়েটির মুখ ঘুরলো এদিকে। সঙ্গে-সঙ্গে অরবিন্দ স্পষ্ট দেখতে পেলো সত্যি-সত্যিই সে মাধুরী। মনের মধ্যেটা একটু কেমন করলো যেন—একটু বিবেকের দংশন হয়তো—পরমুহূর্তে ই সামলে নিলে নিজেকে।

খেয়ে উঠে সে আর দেরি করলো না—শুভরাত্রি জ্ঞাপন ক'রে বেরিয়ে পড়লো সেখান থেকে। তারপর পানের দোকান থেকে ছ'খিলি পান এক প্যাকেট সিগারেট কিনে সামনে যে-বাস্ পেলো তাতেই চ'ড়ে অনির্দিষ্টভাবে ঘুরে ফিরে বাড়ি ফিরলো রাত বারোটায়।

মেমসাহেব নিশ্চয়ই এতক্ষণ জেগে নেই; আর থাকলেও তার সঙ্গে দুটো কথা ব'লে শান্তি পাবার আশা করা নিতান্ত মূঢ়তা। ফ্ল্যাটের দরজায় আস্তে সে টোকা দিলো, কলিং বেল টিপলে ফল হ'তো বেশি, কিন্তু যদি অ্যানির ঘুম ভাঙে তবে আজ রাত্রে মল্লযুদ্ধ। প্রায় দশ মিনিট টোকা দেবার পরে বয় এসে আস্তে দরজা খুলে দিলো। অরবিন্দ নিঃশব্দে নিজের শোবার ঘরে ঢুকে নিঃশব্দে পোষাক ছেড়ে শুয়ে পড়লো। ঘুম এলো না অনেকক্ষণ—আর তারপর যখন ঘুমুলো তখন বাকি রাতটুকু সে এমন সব স্বপ্ন দেখলো যা থেকে নির্ঘুম রাত্রিও মানুষের পক্ষে অনেক কাম্য।

দোষ আর কার! সমস্ত দোষ অরবিন্দরই তো। অরবিন্দ যখন ভাইয়ের পয়সায় চার বছর মেম পুষে-পুষে ফতুর হ'য়ে দেশে ফিরলো তখন তার মাথার কোষে-কোষে শয়তানি বুদ্ধি জাল ফেলেছে। দেশে থাকতে তার সুনাম

ছিলো। লেখাপড়ায় ব্রিলিয়েন্ট না-হ'লেও ভালো ছেলে ব'লেই সকলে জানতো। বি. এ. পাশ করবার পরে তার হঠাৎ ঝোঁক চাপলো বিলেত যাবে। ব্যারিস্টারি পড়বে। অরবিন্দর দাদা অনন্তবাবু তখন রাঙামাটির সিভিল সর্জন। তিনি ভাইয়ের ইচ্ছাকে সদিচ্ছা ব'লেই মনে করলেন এবং বিনা আপত্তিতে চোখের জল সামলে রাজি হলেন। অরবিন্দ দেখতে অদ্ভুত সুন্দর। তার স্বাস্থ্য, তার রং, তার চালচলন কথাবার্তা সমস্তই নিখুঁতভাবে সুন্দর এবং বিলেত গিয়ে এই সৌন্দর্যই তার কাল হ'লো। সেখানে গিয়ে অত্যন্ত সহজেই মেয়েদের মনোহরণ করলো এবং শেষ পর্যন্ত শস্তা মেয়েদের পিছনে ঘোরাটাই পেশা ক'রে চার বছরে ভাইয়ের রক্ত-জল-করা সঞ্চিত সমস্ত অর্থ খুইয়ে—ফতুর হ'য়ে দেশে ফিরে এলো। ফিরে আসার তার একেবারেই ইচ্ছে ছিলো না। যে-রসে সে ডুবে ছিলো সে-রসের বড় আঠা, সাধ্য কী তা থেকে এত সহজেই সে বিচ্ছিন্ন হয়, কিন্তু তবু তাকে আসতে হ'লো—মনের মধ্যে নানারকম প্যাঁচ এঁটে সে লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘরে ফিরে এলো। অনন্তবাবু ভাইয়ের অধঃপতন সমস্তই বুঝলেন কিন্তু কিছুই বললেন না। দিনকয়েক অরবিন্দ ভাইয়ের একান্ত অনুগত থেকে হঠাৎ একদিন ব্যবসা করবে ব'লে

হাজার পাঁচেক টাকা চেয়ে বসলো, ব্যবসা বিষয়ে তার কী পর্যন্ত জ্ঞান তার তালিকাও সে ঘণ্টা তিনেক ব'সে ভাইয়ের কর্ণগোচর করালো, কিন্তু অনন্তবাবু নিঃশব্দে ব'সে পাইপ টানতে লাগলেন, জবাব দিলেন না।

সেদিন রাত্রেই তিনি শুয়ে-শুয়ে স্ত্রীকে বললেন, 'ত্যাখো, অরবিন্দর কিন্তু আবার পালাবার মতলব, এখন যে ক'রেই হোক ওকে বাঁধতে হবে।'

'কেন? কী ক'রে বুঝলে?'

'বয়স তো হ'লো, অভিজ্ঞতা বেড়েছে, কাজেই বুঝতে দেরি হয় না।

স্ত্রী অন্নপূর্ণা একটু চুপ ক'রে থেকে বল্লেন, 'বাঁধতে হ'লে তো বিয়ে দেয়া ছাড়া উপায় দেখি না।'

'আমি তো তাই বলি।'

'ত্যাখো ভালো ক'রে ভেবে—'অন্নপূর্ণা চিন্তিতভাবে পাশ ফিরলেন।

অনন্তবাবু অনেক্ষণ পাইপ টেনে আবার বল্লেন—'অরবিন্দ আমার সন্তানের অধিক। আমার সন্তান নেই এ-কথা আমার কখনো মনে হয় না। সেই অরবিন্দ চোখের উপর এমন ভেসে যাবে?'

অন্নপূর্ণা নিঃশ্বাস টেনে বল্লেন, 'সে তো ঠিক কথাই।'

অনন্তবাবুর বহুকাল পরে মনে পড়লো মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তিনি মাকে হারিয়েছিলেন। স্পষ্ট মনে আছে তাঁর ঠিক বাইশ বছর বয়সে যখন প্রৌঢ় পিতা আবার অরবিন্দর মাকে বিয়ে ক'রে নিয়ে এলেন ঘরে। তখন পিতার দুর্মতিতে লজ্জায় ঘৃণায় মর্ম্মাহত হ'য়ে সে গৃহত্যাগ ক'রে চ'লে গিয়েছিলো, কিন্তু এই অরবিন্দর মা, ঐটুকু আঠারো বছরের মেয়ে—ফিরিয়ে আনলো তাকে ঘরে, বিয়ে দিয়ে সংসার পাতলো। তারপর ঠিক মায়ের মতো স্নেহে যত্নে কর্ত্রীত্বে সত্যিকারের মা হ'য়ে উঠলো দু'দিনেই। তিনি যখন মারা যান অরবিন্দ তখন সাত বছরের একফোঁটা ছেলে। অনন্তবাবুর চোখে অরবিন্দর সেই সাত বছর বয়সের পুষ্ট চেহারা ভেসে উঠলো স্পষ্ট হ'য়ে। কী ভালোই তিনি বেসেছিলেন ভাইকে—মুখ ফিরিয়ে স্ত্রীকে বললেন, 'তোমার মনে পড়ে, আনু—অরবিন্দর মায়ের মৃত্যুর কথা?'

'তা আর পড়ে না। একফোঁটা তখন অরবিন্দ—আমার হাত ধ'রে উনি কেঁদে ফেল্লেন, "বৌমা, আজ থেকে তুমিই এর মা,"—অন্নপূর্ণার মুখ করুণ হয়ে উঠলো বলতে-বলতে।

অনন্তবাবু বিষণ্নভাবে আধ-শোয়া অবস্থায় ব'সে রইলেন অনেকক্ষণ—তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন।

তারপরেই অরবিন্দর বিবাহপর্ব। মাধুরীর বাবা মৃত্যুঞ্জয় মিত্র অরবিন্দকে দেখে একেবারে ভুলে গেলেন, মাধুরী তখন আই. এ. পড়ে বেথুনে। আঠারো বছরের মেয়ে। কাঠের কারবারে লক্ষপতি মৃত্যুঞ্জয় মিত্র বিনা-দ্বিধায় অরবিন্দর সঙ্গে মাধুরীর বিয়ে দিলেন। বিয়েতে তিনি হাজার দশেক টাকা খরচ করলেন, তা ছাড়া মেয়েকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত মুড়ে দিলেন সোনা দিয়ে। বিয়েতে মাধুরীর একান্ত অমত ছিল। বেচারা এমনিতেই ছেলেমানুষ, তার উপর নতুন-নতুন কলেজের স্বাদ পেয়েছে, এ রকম হুট্ ক'রে বিয়ে করাটা তার ভালো লাগলো না। কিন্তু বিয়ের পর অরবিন্দকে তার সত্যিই ভালো লেগেছিলো। তার মধুর কথাবার্তায় ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ। মৃত্যুঞ্জয়বাবু স্ত্রীকে বললেন, 'কত তোমার ভয় ছিলো—একটা মেয়ে, তাকে আমি জলেই ফেললাম বুঝি। খোঁজ-খবর ছাড়া বিয়ে, দেখছো তো এখন কেমন জামাই?'

মাধুরীর মা তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, 'থাক থাক, আর গর্ব করতে হবে না—মাত্রই তো আজ দশ দিন বিয়ে হয়েছে।'

এদিকে অরবিন্দর বৌদিও মাধুরীকে দেখে একেবারে আত্মহারা হ'য়ে গেলেন। তাঁর সমস্ত রুদ্ধ মাতৃস্নেহে যেন প্রবাহ বইলো মেয়েটির কাঁচা মুখখানির দিকে তাকিয়ে। দশ দিন পরে যখন বিবাহের যাবতীয় অনুষ্ঠান শেষ ক'রে অরবিন্দ ফিরে এলো শ্বশুরবাড়ি থেকে, অনন্তবাবু একটু আড়াল বুঝে স্ত্রীকে বল্লেন, "অরবিন্দকে কেমন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে দেখেছো?"

অন্নপূর্ণা মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন।

'এবার ভাই আমার আর পালাবার নাম করবে না।'

'তা তোমারি তো ভাই।' তারপরে দু'জনেই চোখে চোখ রেখে একটু হাসলেন।

অরবিন্দ মাধুরীকে দেখে একটু অবাক হয়েছিলো সত্যিই। জীবনে বহু মেয়ে দেখবার তার সুযোগ হয়েছে কিন্তু ঠিক মাধুরীর মতো যেন সে কাউকেই দেখেছে মনে হ'লো না। অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিতে হয় বইকি! কিন্তু একখানা সুন্দর মুখ নিয়েই তো অরবিন্দর কারবার নয়, তাতে তার আশও মেটে না, কাজে-কাজেই মনকে সে প্রশ্রয় দিলো না। প্রেমই বলো যা-ই বলো ও-সব তো সাময়িক একটা উত্তেজনা ছাড়া কিছু নয়—মনে-মনে অরবিন্দ বিবেককে বোঝালো—আর

জীবনে উত্তেজনা যদি ভোগই করতে হয় তবে একাধিক স্ত্রীলোক ছাড়া সেটা সম্ভবই নয়। আর সে-প্রমোদস্থল হচ্ছে ইওরোপ। অতএব দিন কুড়ি পরে একদিন রাত বারোটার সময় সে নিঃশব্দে উঠে বসলো বিছানায়। মাধুরী নিরুদ্বেগে ঘুমুচ্ছিলো বালিশে মাথা রেখে—বড় সুন্দর ওর ঘুমন্ত মুখ। ক্ষণিকের জন্য অরবিন্দর মুখ নেমে এসেছিলো ওর মসৃণ শাদা কপালের উপর কিন্তু তক্ষুনি সংযত হয়ে মনকে শাসালো, ছিঃ। নীল শেড্ দেওয়া টেব্ল-ল্যাম্পের মৃদু আলোকে সে অনায়াসেই ঘরের সব কিছু দেখতে পায়, বালিশের তলা হাত্ড়ে বের করলো আলমারির চাবি—তারপর অত্যন্ত মৃদু পদক্ষেপে এগিয়ে এলো আলমারির কাছে। সমস্ত গহনা, মায় অরবিন্দর মৃত মায়ের চিহ্ন মুক্তার কণ্ঠিটি পর্যন্ত পুঁটুলি বেঁধে সে যখন আলমারি বন্ধ ক'রে বালিশের তলায় চাবি রাখলো—তখন থরথর ক'রে পায়ের তলাটা একটু কেঁপে উঠলো তার, কিন্তু সে মাত্র একটা পলক—তার পরেই নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়।

তার পরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত। যথারীতি খোঁজ খবর টেলিগ্রাম সমস্তই হ'লো এবং অবশেষে মাধুরী ফিরে এলো তার পিত্রালয়ে। অনন্তবাবু এ-আঘাতের পরে খুব বেশিদিন

বেঁচে ছিলেন না। তাঁর মৃত্যুর পরে অন্নপূর্ণার কী গতি হ'লো মাধুরী কোনো খবরই নিলো না। মাস ছয়েক পরে সিঁথির সিঁদুর নিজের হাতে ঘ'ষে-ঘ'ষে তুলে শাঁখা নোয়া খুলে ফেলে সে আবার মাধুরী মিত্র নাম নিয়ে কলেজে ভর্তি হল। অমঙ্গল আশঙ্কায় তার মা আপত্তি তুলেছিলেন প্রথমে কিন্তু ও এমন ভাবে তাকালো মায়ের দিকে যে মা আর দ্বিতীয় কথা বলতে সাহস পেলেন না। তারপর এই আট বছরে যা পরিবর্তন হয়েছে তা এই যে মাধুরীর বাবা মারা গেছেন, মাধুরী এম. এ. পাশ করেছে এবং তার বয়স হয়েছে ছাব্বিশ।

ভোরের দিকে অরবিন্দর ঘুমের একটা মধুর আমেজ এসেছিলো কিন্তু অ্যানির সরু তীক্ষ্ণ কণ্ঠের চীৎকারে তা ভেঙে গেলো। ভয়ে-ভয়ে উৎকর্ণ হ'য়ে সে ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে উঠে বসলো বিছানায়, মনে-মনে নিজে থেকেই কৈফিয়ৎ প্রস্তুত হ'তে লাগলো—কালকে অত রাত্তিরে ফেরার অপরাধের। এর মধ্যেই দরজায় অ্যানির টোকা শুনে সে যথাসম্ভব হাসিভাব মুখে এনে লাফ দিয়ে দরজা খুলে বললে, 'গুড্ মর্নিং।'

'গুড্ মর্নিং,' অ্যানির গম্ভীর স্বর বেরুলো। অরবিন্দ চেয়ার টেনে ওকে বসতে অনুরোধ ক'রে সিগারেট ধরালো, তারপর নিজে থেকেই বললো, 'কালকে বিয়ে-বাড়ি থেকে ফিরতে বড়ই রাত হ'য়ে গেলো, তাই আর তোমাকে বিরক্ত করিনি—তুমি ঘুমিয়েছিলে, তাই—'

'চুপ করো'—অরবিন্দর পক্ষে রক্ত-জল-করা সুরে অ্যানি বললো—তারপর হলদে রংয়ের গাউনটা অনর্থক এপাশ থেকে ওপাশে দু'একবার নেড়ে-চেড়ে রূঢ় স্বরে বললে, 'আর কতদিন এ-রকম ভাবে চলবে ঠিক করেছো? তোমার সঙ্গে যখন স্বামী ছেড়ে বেরুই তখন কি এই কথা ছিলো? তোমরা ভারতীয়—কালো চামড়ার মানুষ—সুতরাং বিশ্বাসঘাতকতা যে তোমরা করবেই এ বুদ্ধি তখন আমার ছিলো না ভেবে আমি এখন অনুতপ্ত।'

'কেন, আমি কি তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করি?

'নিশ্চয়ই'—অ্যানি এত জোর দিয়ে কথাটি উচ্চারণ করলে যে অরবিন্দর বুক কেঁপে উঠলো—'আমি তোমাকে অর্থবান ভেবেছিলাম, তুমি বোধ হয় বুঝতেই পেরেছিলে যে তোমার রূপ আমাকে তিলমাত্র আকর্ষণ করেনি—করেছিলো তোমার টাকা, আর তুমিও আমায় সেই প্রলোভন

দেখিয়েই বিয়ে করেছিলে—আশা করি সে-কথা তোমার মনে আছে।'

'আছে।'

'তুমি লম্পট! তুমি জোচ্চোর! তাই ভান করতে তোমার এতটুকু আটকায়নি। কোথায় গেলো সেই অর্থ? বম্বে থাকতে তবু কিছু রোজগার ছিলো—আর এই দু'মাসে কলকাতা এসে মাসে চার-পাঁচশো টাকার অর্ধপয়সা বেশি হয় না। তাও তো আদ্ধেকের উপরে আমার নিজের উপার্জন।'

'খরচও তো তোমারি সব।' অরবিন্দ অনেক সাহস সঞ্চয় ক'রে কথাটা বললো। কিন্তু উত্তরে অ্যানি এমনভাবে তাকালো যে অরবিন্দর সমস্ত সাহস ফুৎকারে নিবে গেলো।

'আমি চাই টাকা'—অ্যানির ভদ্রতার মুখোস আর রইলো না—'বুঝতে পেরেছো, টাকা! আমেরিকা থাকতে ফ্যাক্টরিতে যখন কাজ করতে তখন বহু মেয়েমানুষ তোমাকে পুষতে দেখে প্রলোভনে পড়েছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি মেয়ে ভাগানোই ছিলো তোমার ব্যবসা। তাছাড়া একবার তুমি দেশে বিয়ে ক'রে আবার আমায় বিয়ে করেছো কেন? তোমাকে আমি জেল খাটাতে পারি, জানো? তিরিশ হাজার

টাকার দাবিতে আমি ডিভোর্স আনবো ; তারপর তোমাকে পথে-পথে ভিক্ষে করতে দেখে দেশে ফিরে যাবো। জানো তো আমি শাদা চামড়ার মেয়ে?' বলতে-বলতে অ্যানি তার শাদা বাহু অরবিন্দর দিকে প্রসারিত ক'রে দিলো— 'আর দেখছো আমার রূপ—যে-কোনো যুবককে আমি একটি ইঙ্গিতে এখনো ঘুরিয়ে দিতে পারি।' অরবিন্দ নিঃশব্দে ব'সে রইলো বিছানায়—একটি শব্দও আর উচ্চারণ করলো না। অ্যানি চেয়ার ছেড়ে উঠে বললো, 'আমি আর তোমাকে বিরক্ত করতে চাই না, তবে আর একটি মাস আমি তোমাকে সময় দিলাম—এর মধ্যে তুমি আমার ইচ্ছেমতো যদি ভালোভাবে চলো এবং তোমার উপার্জন যদি বাড়ে তো ভালো, নয়তো আমি আর তোমার সঙ্গে থাকবো না।' অ্যানি বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে আর অরবিন্দ ব'সে রইলো স্থাণুর মতো।

খানিকক্ষণ পরে নেপালি বয় ট্রেতে ক'রে তার ঘরেই ছোটা হাজারি এনে হাজির করলো।

'কেন এনেছিস?' অরবিন্দ রুখে উঠলো বিছানায় ব'সেই।

বয়টাকে একটু ঘাবড়াতে দেখা গেলো না, মেমসাহেব যখন বেরিয়ে গেছেন তখন আর ভাবনা কী—অরবিন্দকে

সে ভয় পায় না কিন্তু ভালোবাসে—খুব ভালোবাসে কেননা সে বুঝেছে বাইরের অরবিন্দ তার একটা খোলস মাত্র—ভিতরের মানুষটি অত্যন্ত ভীরু, কোমল। মেমসাহেব অরবিন্দকে যখন নির্যাতন করে তখন তার মনে হয় কোমরের পেটি থেকে কুক্‌রি খুলে তার শাদা বুক লাল ক'রে দেয়—কিন্তু তার কাপুরুষ মনিব নিঃশব্দে কুকুরের মতো হজম করে।

অরবিন্দর ধমকের পরেও সে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো—অরবিন্দ চায়ে চুমুক না-দেওয়া পর্যন্ত সে যাবে না। একটু পরে অরবিন্দ আবার বললে, 'দাঁড়িয়ে আছিস যে?'

'চুয়া পানি ঠাণ্ডা ভৈ গয়'—

'ভৈ গয় তো তোর কী? তুই যা।'

'বাবু চুয়া পিও'—অত্যন্ত স্নেহের স্বর বেরুলো নেপালির গলা থেকে। অরবিন্দর মনের মধ্যে হঠাৎ ধাক্কা লাগলো। দ্বিতীয় কথা না-ব'লে সে আস্তে চা ঢাললো পেয়ালায়—মনে হ'লো কতকাল পরে তার কোনো প্রিয়জন কাছে ব'সে খাওয়াচ্ছে। খেতে-খেতেই বাইরের ঘরে লোকজনের খস্‌খস্ শোনা গেলো—বয় তাড়াতাড়ি গেলো তাদের বসাতে

আর অরবিন্দ ত্রস্তে চা সেরে কাপড়-চোপড় বদলাতে উঠে এলো।

অরবিন্দ যে কাজ করে সেটা একটু অভিনব। কুৎসিত মানুষ সুন্দর করা, মোটাকে রোগা করা, সোজা চুল কোঁকড়া করা—এ সমস্ত কথাই তার সাইনবোর্ডে লেখা আছে। বম্বেতে এসে সে এই ব্যবসা ক'রে যথেষ্ট উপার্জ্জন করেছে দু'বছরে—কিন্তু তার পরই তার বুজরুকি আর লোকে বিশ্বাস করতে চাইলো না। বুদ্ধিটা অবশ্য অ্যানির, এজন্য তাকেই ধন্যবাদ দিতে হয়—আর সে সত্যি পারেও এ-সব কাজ—ভ্রু চাঁছা, চোখ টান করা, চামড়া শাদা করা, ঠোঁট ধনুকের মতো করা—কিন্তু অরবিন্দর এ-সব ঠিক আসে না—তাছাড়া যে-সমস্ত কথা বললে ব্যবসাতে লোক জমানো যায় সে-সমস্ত সে আয়ত্ত করতে শেখেনি। কতকাল আর থাকা যায় জোচ্চুরি ক'রে—অরবিন্দ ট্রাউজর্সের মধ্যে শার্ট ঢোকাতে-ঢোকাতে ভাবলো—এবার সে নিশ্চয়ই এ-সব ছেড়ে দেবে, কোনো ইস্কুলে মাষ্টারি—বীমার দালালি—যা হোক একটা চোখ বুজে সে—

চিন্তায় বাধা পড়লো—বয় এসে তাড়া দিলো বাইরে যাবার জন্য। হঠাৎ অরবিন্দর কী হ'লো, নিমেষে টান

মেরে গা থেকে খুলে ফেললো শার্টটা তারপর ধপ্ ক'রে বিছানায় ব'সে প'ড়ে অত্যন্ত ঠাণ্ডা সুরে বললে, 'ব'লে দে আজ সাহেবের অসুখ—কাজ বন্ধ।' তারপর ব'সে-ব'সেই সে অনুভব করতে লাগলো বাইরের ঘরের অস্পষ্ট চলা-ফেরার শব্দ আর দু'একটা কথার টুকরো। অনেক শিকার গেলো, যাকগে। অলসভাবে উঠে অরবিন্দ একটা সিগরেট ধরিয়ে টানতে লাগলো।

বেলা প্রায় এগারোটায় অ্যানি ফিরে এলো কোথা থেকে—আজকাল তার বন্ধু জুটেছে অনেক। জুটুক, অরবিন্দর আপত্তি নেই—ও যদি কারো সঙ্গে চ'লে গিয়ে তাকে মুক্তি দিতো তবে সে মাথা মুড়িয়ে গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে পারতো। কিন্তু অ্যানি যে বড় ধূর্ত। অরবিন্দ ততক্ষণে দাড়ি কামিয়ে স্নান সেরে দরকারি চিঠিপত্র লিখতে বসেছে—অ্যানি এসে সোজা তার ঘরেই ঢুকলো।

'কেমন লোক হয়েছিলো আজ?'

'একজনও না—'

'একজনও না! স্কাউণ্ড্রেল, মিথ্যে কথা বলছো!'

'মিথ্যে কথা বলাই তো আমাদের ব্যবসা—'

অ্যানির মুখ লাল হ'য়ে উঠলো রাগে—'ও সমস্ত চলবে না, যা পেয়েছো সব দাও।'

'সত্যি কিছু পাইনি।'

'ফের মিথ্যে কথা বলছো?'

'মিথ্যে কথা কেন বলবো, ভারতীয়রা মিথ্যে কথা বলে না।'

'রোগ্'—অ্যানি ক্ষেপে গেলো। পাছে অরবিন্দ ঠিক-ঠিক মতো সব না দেয় এজন্য খদ্দের চ'লে না-যাওয়া পর্যন্ত অ্যানি কক্ষনো বেরোয় না বাড়ি থেকে—আজ ক'দিন থেকে অবিশ্যি বেরুচ্ছে কিন্তু ফিরে এলে অরবিন্দ কড়ায়-ক্রান্তিতে তাকে সমস্ত দিয়ে দেয়। আজকে অরবিন্দর মতিগতি দেখে সে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো। ঝড়ের মতো সে তক্ষুনি আবার বেরিয়ে গেলো বাড়ি থেকে। আর অরবিন্দ পরম নির্বিকার-ভাবে ব'সে অর্ধসমাপ্ত চিঠি শেষ ক'রে ব্যাঙ্কের বই খুলে দেখতে লাগলো কত আছে তার হাতে। অরবিন্দর এত সাহস হ'লো কী ক'রে সে-কথা সে নিজেই বুঝলো না —অ্যানির সঙ্গে প্রকাশ্য ঝগড়া ক'রে তার এ-কথা একবারও মনে হ'লো না এর পরে কী হবে। চেয়ার ছেড়ে উঠে শিষ্ দিতে-দিতে সে সমস্ত ঘর ঘুরতে লাগলো, আর কেমন একটা উত্তেজনায় কপালের শিরাগুলো দপ্‌দপ্ করতে লাগলো।

সমস্ত দিন কিন্তু অ্যানি ফিরলো না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে অরবিন্দ যখন খেতে বসলো তখন অ্যানির জন্য কেমন যেন তার মমতা হ'লো। আহা—কত দূর দেশ থেকে সুদ্ধু এই টাকার লোভে মেয়েটা এসেছে তার সঙ্গে—সত্যিই তো আশানুরূপ সে কী পেলো? আমেরিকা থাকতে অরবিন্দ দু'হাতে উপার্জন করেছে। বাড়ি করেছিলো, গাড়ি করেছিলো, মন টি'কলো কই তবু? শেষের বছরটায় তার দেশে ফেরবার জন্য পাগল হ'তে বাকি ছিল। কোথা থেকে জুটলো এই মেয়েটা? শেষের দিকে অরবিন্দর আর স্পৃহা ছিলো না মদে মেয়েমানুষে—কিন্তু এই মেয়েটা আবার ভজালো তাকে। কেন সে মজলো? অরবিন্দ কাঁটা-চামচে নিয়ে ঠুকঠুক করতে লাগলো প্লেটের মধ্যে। আজ ফিরে আসুক অ্যানি—অ্যানি যা চায় সব দিয়ে সে তাকে ঠাণ্ডা ক'রে বিদায় দেবে—সমস্তই তো প্রায় গেছে—যা আছে তাও যাক্—সব যাক—তারপর আবার সেই বারো বছর আগেকার অরবিন্দ। বারো বছর আগেকার অরবিন্দ, বারো বছর আগেকার অরবিন্দ—কথাটা বারে-বারে মনের মধ্যে নাড়া-চাড়া ক'রে ভারি ভালো লাগলো তার।

বেলা চারটে পর্যন্ত ঘন-ঘন ঘড়ি দেখে-দেখে অরবিন্দ

ক্লান্ত হ'লো তবু অ্যানি ফিরে এলো না। মনটা একটু কেমন বিষণ্ণ লাগলো যেন। চারটের পর সে বেরুলো। কেন বেরুলো, কোথায় যাবে কিছু তার মনে হ'লো না। ধরমতলা দিয়ে এস্‌প্লানেডে এসে সে কালিঘাটের ট্রামে চ'ড়ে এগিয়ে এলো গড়ের মাঠের পাশ দিয়ে। ফুরফুরে হাওয়া—অরবিন্দর সমস্ত শরীর মনে এক আশ্চর্য মুক্তির আনন্দ। জগুবাবুর বাজারের কাছে এসে সে নেমে পড়লো লাফ দিয়ে, তারপর রাস্তা পার হ'য়ে দেবেন্দ্র ঘোষ রোড দিয়ে সোজা এসে দাঁড়ালো হরিশ মুখার্জি রোডের উপর। ভিতরে-ভিতরে এই রাস্তাটিই যে তাকে সমস্তটা দিন ধ'রে এক দুর্নিবার আকর্ষণে টেনেছে এটা সে এতক্ষণ পরে বুঝতে পেরে হঠাৎ যেন থমকে গেলো। নিঃশ্বাসটা কেমন ভারি বোধ হ'লো—স্তব্ধ হ'য়ে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলো অনেক্ষণ—তারপর আবার ধীর পায়ে দেবেন্দ্র ঘোষ রোড দিয়ে ফিরে এলো বড় রাস্তায়। লাল রংয়ের একটি দোতলা বাড়ির ছবি তার মনে হ'লো চকিতে—মনে হ'লো আট বছর আগেকার আঠারো বছরের একটি মেয়ে। আর তারপর সেই কালকের দেখা মাধুরী—ঐ যে ট্রাম যায়—অরবিন্দ টপ্ ক'রে উঠে পড়লো লাফ দিয়ে কিন্তু বসতে

গিয়েই যাকে দেখলো তাকে দেখে সে আর বসতে পারলো না—অদ্ভুত এক উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলো ভিতরটা—ট্রামের দরজার হাতলটা ধ'রে দাঁড়িয়ে রইলো মূঢ়ের মতো।

মাধুরী কি দেখেনি অরবিন্দকে? দেখেছে। কালও দেখেছে, আজও দেখছে। তাছাড়া চিনতেও তার একটি নিমেষ ক্ষয় করতে হয়নি। কালকে দেখে তার সমস্ত রক্ত বোধ হয় মাথায় উঠে এসেছিলো, আর আজকে দেখেও তার কান জ্বালা করতে লাগলো। মনে হ'লো এই মুহূর্তে নেমে যায় ট্রাম থেকে। ভিতরে-ভিতরে তার কেমন একটা যন্ত্রণা হ'তে লাগলো, কিন্তু অসহায়ভাবে ব'সে রইলো সে চুপ ক'রে। তার নিজের উপর রাগ হ'লো। কেন, কেন এই লোকটা সম্বন্ধে সচেতনতা? এ লোকটা তার কে? সে মাধুরী মিত্র, তার হাতে শাঁখা নেই, তার কপালে সিঁদুর নেই—কখনো তার বিয়ে হয়নি—তবু এই লোকটার অস্তিত্বে তার এই যন্ত্রণা কেন? উৎকণ্ঠিতভাবে সে অপেক্ষা করতে লাগলো এলগিন রোডের মোড়টুকুর জন্য। কী কুক্ষণে আজ সে বেরিয়েছিলো—এলগিন রোডে এসে পৌঁছতে দেরি হ'লো না। মাধুরী নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো। রাস্তা ছেড়ে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত হ'য়ে

স'রে দাঁড়ালো অরবিন্দ, আর অরবিন্দর ঠিক বুকের পাশ দিয়ে নিঃশব্দে নেমে এলো মাধুরী। অরবিন্দ আস্তে এসে মাধুরীর পরিত্যক্ত আসনে ব'সে তাকিয়ে রইলো বাইরের দিকে—আর থেকে-থেকে শিরশির করতে লাগলো বুকের ভিতরটা।

বাড়ি ফিরে শুনলো মেমসাহেব ফিরেছেন—অরবিন্দ তক্ষুনি অ্যানির ঘরে টোকা দিয়ে ঢুকলো। দেখলো ঘর অন্ধকার—পুবের দিককার খোলা জানালার আবছা আলোয় দেখা গেলো অ্যানি একটা ইজি-চেয়ারে শুয়ে আছে কপালে হাত রেখে। অরবিন্দ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হ'য়ে কাছে এসে বললো, 'অ্যানি, সমস্ত দিন তুমি কোথায় ছিলে?'

অ্যানি জবাব দিলো না।

'তুমি রাগ করেছো?'—অরবিন্দর স্বভাবমধুর স্বর বেরুলো এবার—'রাগ কোরো না—তুমি যা চাও তাই হবে।' অ্যানি এবার ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলো—'তুমি সকালে আমাকে ঠকালে কেন?' কথার স্বর ভাঙা-ভাঙা—অরবিন্দর মনে হ'লো অ্যানি কেঁদেছে—আস্তে অ্যানির একখানা হাত চুম্বন ক'রে সে বললে, 'আমি সত্যিই ঠকাইনি—ভোরে আজ আমি একটি খদ্দেরও গ্রহণ করিনি—সবাইকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম।'

'কেন ?' অ্যানির স্বর রূঢ় শোনালো।

'কেন আর কী—এমনি ! আমি ভেবেছি এ-রকম লোক ঠকিয়ে উপার্জন আর করবো না।'

'ও—এতদিনে বুঝি বিবেক গজালো ? আমার ব্যবস্থা ?'

'তুমি যে রকম চাও।'

'আমি যা চাই তা তুমি মেটাতে পারবে ?'

'চেষ্টা করবো।'

অ্যানি চুপ ক'রে রইলো।

অরবিন্দ সস্নেহে বললে—'আমি তোমাকে সত্যিই ঠকিয়েছি—তুমি তো রাগ করতেই পারো, তবে আমি ভেবেছি—আমার কাছে যা-কিছু আছে সমস্ত কুড়িয়ে-কাচিয়ে হাজার পনেরো হয়তো হবে—দু'এক হাজার আমি রেখে সমস্তই তোমাকে দিয়ে দেবো—তাছাড়া এই বাড়ির আসবাবপত্র বেচেও কিছু পাবে নিশ্চয়—সব নিয়ে তুমি দেশে ফিরে যাও, ইচ্ছেমতো বিয়ে ক'রে আবার সুখী হও।'

'ওঃ, এত দয়া তোমার !'

অ্যানি যেন হঠাৎ স্বপ্ন দেখে কথা ক'য়ে উঠলো।

পরের দিন থেকে অ্যানির স্বভাব দেখে ভৃত্যমহল অবাক হ'য়ে গেলো। বিলিতি মেয়ের যতখানি ভদ্রতা জানা থাকে

সমস্তই অকৃপণভাবে অরবিন্দর উপর প্রয়োগ করলো। এক রাত্রির মধ্যে যেন একটা ভোজবাজি হ'য়ে গেলো। তারপর পনেরো দিন সমানে ঘুরে-ঘুরে অরবিন্দ এক বীমার আপিশে দেড়শো টাকা মাইনের এক কাজ পেলো এবং আর পনেরো দিনের মধ্যে বাড়ির আসবাবপত্র বেচে শ' পাঁচেক টাকা এবং চোদ্দ হাজার টাকা নগদ দিয়ে অ্যানিকে জাহাজে তুলে দিয়ে এসে জীবনের মতো নিশ্চিন্ত হ'লো। এবার মনে হ'লো তার বৌদির কথা। দাদার মৃত্যুর খবর সে বিলেত থেকেই জানতে পেরেছিলো, তারপরে অভাগিনী বৌদি যে কোথায় কার আশ্রয়ে কী ভাবে আছেন তা সে কিছুই জানতে পারেনি। শ্যামবাজারে বৌদির এক দাদা ছিলেন এ-কথা সে জানতো কিন্তু এতদিন তাঁরা সেই একই বাড়িতে আছেন কিনা এ-বিষয়ে অরবিন্দর সন্দেহ হ'লো। তবুও একদিন সন্ধেবেলা যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় ক'রে সেই বাড়িতে গিয়েই উপস্থিত হ'লো। আশ্চর্য, এখনো দাদার সাইনবোর্ডটি ঝোলানো আছে সামনের দরজায়। অরবিন্দ সসঙ্কোচে ভিতরে গিয়ে বেল্ টিপতেই একটি চাকর বেরিয়ে এলো।

'নগেনবাবু বাড়ি আছেন?'

'না, কর্তা বাইরে গেছেন।'

অরবিন্দ বললে, 'নগেনবাবুর এক বিধবা বোন এখানে থাকেন জানো ?'

চাকরটি ঈষৎ চিন্তা ক'রে বললে, 'কে, বড় পিসিমা ?' আন্দাজেই অরবিন্দ বললো, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বড় পিসিমাই—যাঁর ছেলেপুলে নেই।'

'তিনি আছেন।'

অরবিন্দ হাতে স্বর্গ পেলো। 'এক্ষুনি তাঁকে ডাকো, বলো যে তার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছেন। আমার তাঁকেই দরকার।' এমন অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে অরবিন্দ কথাটা বললো যে চাকরটি পর্যন্ত একটু অবাক হ'লো। যাই হোক, ভিতরে গিয়ে সে খবর দিতেই অন্নপূর্ণাকে খানিক পরে দরজার সামনে দেখা গেলো। অরবিন্দ অনেকক্ষণ পর্যন্ত চোখ তুলে তাকাতে পারলো না, তারপর এক সময় নতমুখে উঠে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রে বললো, 'বৌদি, আমাকে ক্ষমা করো।' অন্নপূর্ণার দু' চোখ ভ'রে জল এলো—নতুন ক'রে মনে পড়লো তাঁর সমস্ত কথা। নিঃশব্দে তিনি অরবিন্দর মাথায় হাত ছোঁয়ালেন।

অরবিন্দ যে কী কথা বলবে ভেবে পেলো না। শাদা ধবধবে থান কাপড়ে আর অলঙ্কারহীন শূন্য হাত দু'খানায়

তাঁকে যে কী অদ্ভুত লাগলো অরবিন্দর চোখে, অনেকক্ষণ সে কথা বলতে পারলো না।

অন্নপূর্ণা জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছো?'

'ভালোই। তোমার শরীর ভালো আছে? নগেন-দা কোথায়?' অরবিন্দ সহজ হবার চেষ্টা করলো।

'দাদার তো ঐ দাবার নেশা—তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো। কবে এলে?'

'এসেছি অনেকদিন, এতদিন তোমার কাছে আসবার মত অবস্থায় ছিলাম না। এখন আমি একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট নিয়ে একা আছি ধরমতলায়, তোমাকে নিয়ে যাবো ব'লে এলাম।'

'আমাকে?'—অন্নপূর্ণা কেমন অদ্ভুতভাবে হাসলেন, একটু থেমে বল্লেন, 'যিনি তোমার কাছে থাকতে পেলে এখনো সংসারে বেঁচে থাকতেন তিনিই গেছেন।'

'বৌদি, তুমি আমার মা, তুমি আমাকে ক্ষমা করো।' অরবিন্দর গলা ধ'রে এলো। সহসা দরজার অন্তরালে একখানা হাসিখুশি চেহারার আভাস পাওয়া গেলো এবং অনতিবিলম্বেই একটি মহিলা এসে সেখানে উপস্থিত হলেন। বছর চল্লিশেক বয়স, ফর্সা ধবধবে, কপালের উপর এত বড় সিঁদুরের ফোঁটা, আধা-ময়লা একখানা লাল পাড়ের শাড়ি

পরনে। লক্ষ্মীশ্রীতে ঝলমল করতে-করতে সেখানে এগিয়ে এলেন। 'দিদি, অরবিন্দ এসেছে আমাকে বলোনি যে? আমি গলা শুনতে পেয়েই বুঝতে পেরে ছুটে এলাম। তারপর, অরবিন্দ, কবে এলে তুমি?' আনন্দমিশ্রিত বিস্ময়ে অপরূপভাবে হাসতে লাগলেন তিনি। 'আরে বৌদি যে, কেমন আছো?' অরবিন্দর স্বাভাবিক প্রফুল্ল স্বর আপনা থেকেই বেরিয়ে এলো এবার নগেনদার স্ত্রীকে দেখে—'বাঃ তুমি দেখছি একটুও বুড়ো হওনি'—নত হ'য়ে সে পায়ের ধুলো নিতে এলো। হৈমন্তী খপ ক'রে ওর দু'হাত চেপে ধরলেন, 'করো কী, করো কী—সাহেবমানুষ প্রণাম-ট্রনাম করে না, এমনিতেই সুখে থাকো। কবে এলে তুমি? খবর কী তোমার? বোসো বোসো—চা খাবে না?' হৈমন্তী ঠিক সেই রকমই আছেন। অরবিন্দর ভিতরটা ফুটতে লাগলো আনন্দে।

'চা তো নিশ্চয়ই খাবো কিন্তু তার আগে তুমি বোসো তো একটু—বৌদি, তুমিও বসছো না কেন?'

'না, তোমরাই বোসো। আমি বরং চায়ের ব্যবস্থা ক'রে আসি।' অন্নপূর্ণা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

'অরবিন্দ, তুমি আগের মতো চায়ের সঙ্গে পেঁয়াজকুচো,

শুকনো লঙ্কা আর আলু দিয়ে চিঁড়েভাজা খেতে ভুলে গেছো নিশ্চয়ই।'

'একটুও না—ভেজেই সেটা পরীক্ষা করো না আজ।'

'তবে যাই আমি ভাজি গিয়ে।' হৈমন্তী চেয়ার ছেড়ে উঠলেন।

'চলো আমিও যাই।'

'তুমি যাবে রান্নাঘরে? না বাপু, তুমি সাহেবমানুষ, এখানেই ব'সে থাকো।'

অরবিন্দ মৃদু হেসে হৈমন্তীর পিছন-পিছন বাড়ির ভিতরে এলো। এ বাড়ি তার নখদর্পণে।

বৌদির সঙ্গে কতবার সে এখানে এসেছে, কত জ্বালিয়েছে এদের হল্লা ক'রে। ছেলেমানুষের মতো কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে সে ঘুরে-ঘুরে বাড়িটি দেখতে লাগলো।

খানিক পরেই নগেনদা এলেন। অবাক হ'য়ে গেলেন তিনি। হাসিতে গল্প গুজবে রাত দশটা পর্যন্ত কাটিয়ে অরবিন্দ নতুন জীবন নিয়ে ফিরে এলো বাড়িতে।

যাবার সময় অরবিন্দ অনেক সংকোচ, অনেক ভয়, অনেক

উৎকণ্ঠা নিয়ে গিয়েছিলো কিন্তু সেখানে কেউ তার সম্বন্ধে একটি কথা জিজ্ঞাসা করলো না এবং যে-নামটির আদ্যাক্ষর উচ্চারণ করলেও তার হৃৎকম্প হ'তো সেই মাধুরীর সম্বন্ধেও কেউ সেখানে টুঁ শব্দ করলো না। তাঁদের এই কৌতূহলহীন সভ্য মনের পরিচয়ে অরবিন্দ কৃতজ্ঞ হ'য়ে উঠলো। এটুকু সে বুঝলো যে এর মধ্যে বৌদির ইঙ্গিত রয়েছে। বৌদির চিরসংযমী স্বভাবের কাছে বহুবারের মতো আবার নতুন ক'রে সে মাথা নোয়ালো।

অরবিন্দর-যে চাকরি তাতে ছুটির বালাই নেই। সাড়ে ন'টায় প্যাণ্টের উপর কোট চাপাতে-চাপাতে ছোটে আর ফেরে আলো জ্বললে। সেই নেপালি চাকর পহালমন আছে তার সঙ্গে। সেবায় যত্নে সে তাকে আগলে রাখে মায়ের মতো। ফিরে এলে দেরির জন্য অনুযোগ করে আর শরীরের দিকে নজর দিতে উপদেশ দেয়। রবিবার ভোরে উঠেই অরবিন্দ বললে, 'এই পহালমন, আজ আমার বৌদি আসবে, তুই ঘর-টরগুলো কিন্তু সুন্দর ক'রে সাজিয়ে রাখবি।' পহালমনের ফোলা-ফোলা নেপালি চোখ ছোটো হ'য়ে এলো বিস্ময়ে, 'কিস্‌কা বহু? আপকো? আপকো সুহাসিনী?'

অরবিন্দ হেসে ফেললো, 'আরে বহু নয়, বৌদি—বড় ভাইকা সুহাসিনী—ব্যাটা জংলি, এতদিন বাংলা মুলুকে আছিস বাংলা জানিস না।'

'হামি?'—পহালমনের দাঁত বেরিয়ে গেলো এবার—'হামি তো বাংলাই বোলে সরবদা। মাইজি কব্ আয়গা বাবু?'

'আজই! এক্ষুনি আমি তাঁকে আনতে যাচ্ছি—কাপড় চোপড় ঠিক ক'রে দে।'

'ল্‌লোঃ'—পহালমন লাফাতে-লাফাতে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে।

আটটা বাজতেই অরবিন্দ গিয়ে হাজির হ'লো নগেনদার বাড়ি। নগেনদা তখন দ্বিতীয় প্রস্থ চায়ে মশগুল। 'আরে এসো এসো—কোথায় গেলে—ডাকো না তোমার বৌদিকে—' নগেনদা ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন।

'আপনি বসুন না, আমি নিয়ে আসছি ডেকে।' কিন্তু ডাকতে হলো না, তিনি গলা পেয়ে নিজে থেকেই এলেন—'বাব্‌বা, চমৎকার মানুষ ভাই তুমি—' এসেই তিনি অরবিন্দকে অনুযোগ করলেন—'সেই গেছো বুধবার রাত্তিরে আর এলে রোববার সকালে, এর মধ্যে আর তোমার অবসর হ'লো না নাকি?'

অরবিন্দর বৌদিও এলেন, 'এতদিন আসোনি কেন?'—মৃদুকণ্ঠে তিনি বললেন।

'আমার অবসর কোথায়? কী গোলামি আমি করি তা তুমি নিজের চোখেই দেখবে'খন, এই তো রোববারটুকু যা ছুটি।' তারপর নগেনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললে, 'নগেনদা, আমি কিন্তু আজ বৌদিকে নিয়ে যেতে এসেছি।' নগেনবাবুর মুখ হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গেলো। 'তুমি কি পাগল, অরবিন্দ?'

'কেন, এতে পাগলামির কী রয়েছে?'

'তা তো তোমার নিজেরই বোঝা উচিত।' নগেনবাবু চায়ের পেয়ালায় মুখ ডোবালেন, আর অরবিন্দর কান গরম হ'য়ে উঠলো—ইঙ্গিত বুঝে। সহসা জবাব দিতে পারলো না। সেদিন রাত্রের ব্যবহারে তার মনে একটা সূক্ষ্ম আশা বাসা বেঁধেছিলো, সে যে মেম নিয়ে এসেছে এটা বোধ হয় এঁরা কেউ জানেন না। ওঁরা যে সেদিন চেপে ছিলেন সে কথা ভেবে সে ভিতরে-ভিতরে ঘেমে উঠলো। 'আমি অনেক অন্যায় করেছি—কিন্তু তাই ব'লে বৌদির কাছেও কি ক্ষমা নেই নগেনদা?'—কথাটা সে সহজভাবেই বলতে চেয়েছিলো কিন্তু কী-রকম করুণ শোনালো।

অন্নপূর্ণা চুপ ক'রে বসেছিলেন, অরবিন্দর দিকে তাকিয়ে তাঁর চোখে জল এলো। 'ক্ষমা আবার কী ভাই, তুমি যে সত্যিই ফিরে এসেছো নিজের ঘরে, তা আমি তোমার চোখ দেখেই বুঝেছি। কিন্তু তুমি তো জানো বিধবা মানুষের—'

'বিধবার সমস্ত নিয়ম তুমি পালন করতে পারবে, বৌদি— সেখানে আমি একা,'—অরবিন্দ অন্নপূর্ণার মুখ থেকে যেন কথাটা কেড়ে নিয়ে বলতে লাগলো, 'বিশ্বাস করো, সেখানে আমি একা।' পরিপূর্ণ শান্তির সঙ্গে সে এ-কথা উচ্চারণ করলো যে সে একা।

'তবে যে শুনলাম'—নগেনদা অর্ধেক ব'লেই হৈমন্তী ও অন্নপূর্ণার দিকে তাঁর বিস্মিত দৃষ্টি মেলে দিলেন।

'ঠিকই শুনেছিলেন, কিন্তু সে-সব বালাই আর নেই এখন।' নগেনদা কথাটা বিশ্বাস করলেন এবং শেষ পর্যন্ত অরবিন্দর আগ্রহকে আর উপেক্ষা করতে পারলেন না।

অন্নপূর্ণা স্বামীর মৃত্যুর পরেই ভাইয়ের বাড়ি চ'লে এসে-ছিলেন—টাকা-পয়সা অনন্তবাবু কিছুই রেখে যেতে পারেননি —একা অরবিন্দই তাঁকে সর্বস্বান্ত করেছিলো—তবু মৃত্যুর পরে বিশ হাজার টাকার একটি লাইফ-ইনশিওরেন্স পাওয়া

গেলো। নগেনবাবু সমস্ত টাকা অন্নপূর্ণার নামে ব্যাঙ্কে জমা রেখেছিলেন। অরবিন্দর কাছে আসবার দিন পাঁচেক পরে অরবিন্দ যখন শুতে যাবে অন্নপূর্ণা তাকে ডেকে বল্লেন, 'অরবিন্দ—টাকা ক'টা বরং তোমার নামেই বদলে রাখো।'

'ক্ষেপেছো?'—অরবিন্দ সাত হাত পিছিয়ে গেলো—এততেও তোমাদের শিক্ষা হয়নি নাকি? ওসব ঝামেলা আমি আর নেবো না কিছুতে।'

অন্নপূর্ণা তাকে নিজের বিছানার প্রান্ত দেখিয়ে বললেন, 'বোসো একটু, কথা আছে তোমার সঙ্গে।' অরবিন্দ পা ঝুলিয়ে বসতেই তিনি বললেন, 'তোমাকে যখন ভয় ছিলো তখন সে-ভয় কাটাবার জন্যেই একটা গুরুতর অন্যায় করেছিলাম, এখন আর ভয় নেই, টাকাটা তোমার কাছেই রাখো, আর আমার একটা শেষ অনুরোধ যে মাধুরীর একটু খোঁজ নাও। মেয়েটার সর্বনাশের জন্যে আমরাই দায়ী—তোমার দাদার আত্মা শান্তি পাবে না নয়তো।' অন্নপূর্ণার গলা ধ'রে এলো—কেশে নিয়ে বললেন, 'যদি তুমি অনুমতি দাও আমি নিজে যাই তাকে আনতে।'

'সে কি আসবে?' অরবিন্দর জবাবটা বিষণ্ণ শোনালো। 'আসবে না? বলো কি—হিঁদুর মেয়ে, স্বামী ডাকলে কি না

এসে পারে? আর তা ছাড়া ওরা আছেও ভারি কষ্টে। হরিশ মুখার্জী রোডের অত বড় বাড়ীটা মৃত্যুঞ্জয় মিত্র মারা যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই নাকি বিক্রী হ'য়ে গেছে। এতটুকু একটু নিচতলার অংশ নিয়ে ওরা আছে। দাদার কাছে শুনলাম ভদ্রলোক ব্যবসায়ে যেমনি উঠেছিলেন—প'ড়েও গেছেন তেমনি ধাঁ ক'রে। মাধুরী বোধ হয় চাকরি ক'রে।'

'কিন্তু আমার মনে হয়'—অরবিন্দ পরিপূর্ণ বিশ্বাসে মাথা নেড়ে বললো, 'ওখানে গেলে তুমি অপমানিত হ'য়ে আসবে।'

'পাগল!' অন্নপূর্ণা অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন। আর সত্যি-সত্যি নগেনবাবুকে খবর দিয়ে আনিয়ে একদিন তিনি মাধুরীদের বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন। মনে-মনে তাঁরও যে দ্বিধা না ছিলো তা নয়—কেননা মাধুরী যে তাঁদের সম্পর্ক একেবারেই অস্বীকার করেছে একথা তিনি লোক-পরম্পরায় শুনেছিলেন কিন্তু মনের সে-দ্বিধাকে তিনি আমল দিলেন না। হাজার হোক, স্বামীর ডাক তো। অরবিন্দ আপিশে গিয়েছিলো, সে কিছুই জানতো না। বাড়ি ফিরে সে বৌদির ঘরে গিয়ে দেখলো যে তিনি অতিশয় বিষণ্ণ মুখে গালে হাত রেখে ব'সে আছেন বিছানায়।

'এ কী বৌদি, তুমি বিছানায় ব'সে আছো যে সন্ধেবেলা?' অন্নপূর্ণা চোখ তুলে তাকালেন, জবাব দিলেন না।

'কী হয়েছে তোমার?'

'সেখানে গিয়েছিলাম।'

'সেখানে?'—ব'লেই অরবিন্দ কথাটা বুঝতে পেরে চুপ ক'রে গেলো।

'তোমার কথাই ঠিক অরবিন্দ—মাধুরী আমাদের অস্বীকার করেছে।'

'তাই তো উচিত'—অরবিন্দ গলার স্বরে ফাজলেমির ভাব আনবার চেষ্টা করলো।

'কেন—উচিত বললে কেন?'

'বাঃ, উচিত বলবো না—ওর সঙ্গে আমাদের আর সম্পর্কটা হ'লো কবে?'

'কেন, তুমি কি তাকে নারায়ণ সাক্ষী ক'রে বিয়ে করোনি?'

'বিয়ে করলেই কি পতিদেবতা হয়ে বসা যায় নাকি, বৌদি? তোমাদের যুগ আর নেই।'

'আমাদের যুগ না-থাকতে পারে, কিন্তু তাই ব'লে তো সধবা মেয়ে আর কুমারী হ'য়ে যেতে পারে না।'

'হিন্দু বিবাহে যে ডিভোর্স নেই—এটা একটা মস্ত খুঁত তা নইলে সে-বেচারা এতদিনে দিব্যি বিয়ে ক'রে সুখী হ'তে পারতো।'

'কে জানে বিয়েই হয়তো করবার জন্য কুমারী সেজেছে—তোমাকে বলবো কী অরু—সিঁথিতে পর্যন্ত এক ছিটে সিঁদুর রাখেনি মেয়েটা। আমাকে দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে তাকিয়ে রইলো, তারপর মাকে ডেকে দিয়ে বেরিয়ে গেলো।' অরবিন্দ এবার বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো—'ও যদি বিয়ে করে, বৌদি, আমি কিন্তু একটুও বাধা দেবো না।'—ব'লে সে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

পরের দিন সন্ধেবেলা আপিশ থেকে ফিরেই হাতমুখ ধুয়ে আবার পরিপাটি ক'রে পোষাক পরতে বসলো অরবিন্দ।

'এ কী, এক্ষুনি আবার যাচ্ছো কোথায়?'

ধুতির কোঁচাটা বার দুই মুড়ে অরবিন্দ মুখ তুলে বললো, 'মনেই ছিলো না—একটা নেমন্তন্ন রয়েছে যে আজ পাঁচটার সময়—বাজলো তো প্রায় ছ'টা।'

'চায়ের?'

'হুঁ।'

'কোথায়?'

'বালিগঞ্জে।'

অরবিন্দ দ্রুত হাতে চুলে দু'বার বুরুশ বুলিয়ে বেরিয়ে গেলো। রাস্তায় বেরিয়েই সে সর্বপ্রথম দু'খিলি পান কিনে গালে পুরলো—এটা তার অভ্যেস। বিকেলের দিকে সে প্রায়ই বেরোয় না, আপিশ থেকে ফিরতেই তো রাত হ'য়ে যায়, কতকাল যে বিকেল দেখে না তার ঠিক নেই। ভারি ভালো লাগলো তার। বিলিতি গানের কলি আওড়াতে-আওড়াতে সে হেঁটে এগুতে লাগলো। কিন্তু এখন তো তার দেরি করবার সময় নেই, যেতে হবে সেই বালিগঞ্জে। আচ্ছা, বাস্-এ গেলে হয় না? অরবিন্দর মন সায় দিলো না। ছোঃ, বাস্-এ চ'ড়ে নষ্ট করবে নাকি এই অমূল্য বিকেলটি—ট্র্যামে গড়ের মাঠের পাশ দিয়ে—ভাবতেই কী আরাম। অরবিন্দ ট্র্যামে উঠে ব'সে সিগারেট ধরালো।

সুপ্রকাশের সঙ্গে অরবিন্দর লণ্ডনেই প্রথম আলাপ। ছিপ্‌ছিপে সুন্দর এক ছোকরা—দেখলেই ভালো লাগে। বাপ বিহারের মস্ত উকিল—বিস্তর টাকা—নানা দিক থেকেই অরবিন্দর ওর সঙ্গে ভাব জমাবার একটা তীব্র ইচ্ছা হয়েছিলো, আর বন্ধুতা গভীর হ'তেও সময় লাগেনি বেশি। কিন্তু

এই বছর পাঁচেক যাবত তাদের আর দেখাশোনা হয়নি। হঠাৎ কর্পোরেশন স্ট্রীটে পরশু দিন দেখা হ'য়ে গেলো। অরবিন্দ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো ওকে দেখে।

'এ কী! তুমি?'

'আরে অরবিন্দ যে'—পিঠে চাপড় খেয়ে পিছন ফিরে সুপ্রকাশ অবাক হ'য়ে গেলো—'কবে ফিরলে তুমি?'

'এই তো বছর আড়াই, কী আশ্চর্য—তুমি কলকাতায় আছো অথচ এই প্রথম দেখা হ'লো। কী করছো তুমি, কোথায় আছো?'

'আছি বালিগঞ্জে, করি কলেজের রাখালি।'—সুপ্রকাশ মিষ্টি ক'রে হাসলো—'আর তুমি?'

'আমার আর খবর!'—অরবিন্দও হাসলো।

সুপ্রকাশ আন্তরিকভাবে বললে, 'আমার বাড়িতে চলো না।'

'আজ? এখন?' ঈষৎ চিন্তা ক'রে অরবিন্দ বললে, 'না, আজ যাবো না—বরং অন্য একদিন—তোমার ঠিকানা কী?'

সুপ্রকাশ শুধু ঠিকানাই দিলো না, বাঁ হাতের তেলোতে ডান হাতের নখ দিয়ে ছবি এঁকে এঁকে বোঝাতে লাগলো বাড়িটা ঠিক কোথায়।

'বিয়ে করেছো ?' অরবিন্দ জিজ্ঞাসা করলো।

মধুর হাসিতে সুপ্রকাশের মুখ ভ'রে গেলো—'ভেবেছিলাম ও-হাঙ্গামায় আর কাজ নেই কিন্তু সম্প্রতি মনে হচ্ছে বিয়ে ব্যাপারটা তত খারাপ নয়—যত খারাপ ব'লে অন্তত আমার ধারণা ছিলো।'

'কেন বলো তো ?'—অরবিন্দ প্রচণ্ড এক ঝাঁকানি দিয়ে বললে, 'নিশ্চয়ই প্রেমে পড়েছো।'

'উঃ, লাগে—'

'তবে বলো শিগগির—তিনি কোন ভাগ্যবতী যিনি শিবের তপস্যায় বাধা দিলেন।'

'তিনি ভাগ্যবতী কিনা জানি না—তবে আমি যে ভাগ্যবান হবো তাঁকে পেলে এ-কথা নিঃসংশয়েই মনে করতে পারো।'

'তাই নাকি ? তবে তামার এঞ্জেলটিকে একদিন দেখাও না।'

'বেশ তো—পর্শু আমার বোনের জন্মদিন—উনিও আসবেন, তুমিও যেয়ো।—আর শোনো—এ-সব নিয়ে কিন্তু কোনো ইঙ্গিত কোরো না।'

'কেন ?—'

'পাগল! এটা একান্তই আমার নিজের মনের কথা।'

'ভালো! ভালো!'—অরবিন্দ বেপরোয়াভাবে খানিকক্ষণ ওর পিঠ চাপড়িয়ে বিদায় নিলো।

প্রায় সাড়ে-সাতটার সময় অরবিন্দ গিয়ে সুপ্রকাশের ওখানে পৌঁছলো। সুন্দর একতলা বাড়ি—সামনে সবুজ কম্পাউণ্ড, গেট থেকে লাল সুরকির প্রশস্ত রাস্তা গোল হ'য়ে বেঁকে গিয়ে গাড়ি-বারান্দায় ঠেকেছে। বাড়িটি দেখা গেলো ঝকঝক করছে আলোতে, অরবিন্দ একটু ইতস্তত ক'রে আবার নম্বরটা মিলিয়ে ঢুকে পড়লো বাড়ির মধ্যে। একদল অতিথি বোধ হয় ফিরে যাচ্ছিলেন—সুপ্রকাশ আর উনিশ-কুড়ি বছরের একটি মেয়েকে দেখা গেলো বিদায়সূচক নানারকম ভদ্রতা ক'রে তাঁদের বিদায় দিচ্ছে। গাড়িটা হেডলাইট জ্বালিয়ে তার কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলো বোঁ ক'রে—সঙ্গে সঙ্গেই সুপ্রকাশের আন্তরিক কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, 'এই যে অরবিন্দ! অবশেষে এলে তাহ'লে?'—সুপ্রকাশ দ্রুত এগিয়ে এলো—'এই যে আমার বোন সুমিত্রা—এর উপলক্ষ্যেই আজ—।' অরবিন্দ যুক্তকরে অভিবাদন জানালো। সুমিত্রা হেসে বললে, 'আসুন।' সুমিত্রা একটু এগিয়ে যেতেই

সুপ্রকাশ অনুচ্চারিত স্বরে বললে, 'তুমি একটা সিলি—ফুল্—'

'কেন ?'

'এত দেরিতে এলে যে কারো সঙ্গেই তোমার দেখা হ'লো না। আমার এঞ্জেলটিও তো পালাবার উপক্রম করেছিলেন, নানা অছিলায় ধ'রে রেখেছি।'

'তা হ'লেই যথেষ্ট।'

অরবিন্দকে নিয়ে সুপ্রকাশ ড্রয়িংরুমে ঢুকলো। ঘর প্রায় শূন্য। এখানে-ওখানে ছু'চার জন স্ত্রীপুরুষের স্বল্পতম ভিড়—কিন্তু জানালার দিকের সেটি-তে যে-মেয়েটির পাশে গিয়ে সুমিত্রা দাঁড়ালো এবং তাকে বসবার অনুরোধ জানালো তাকে দেখে অরবিন্দর হৃৎপিণ্ডটা ধ্বক্ ক'রে উঠলো। সুমিত্রা মাধুরীর সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলো বটে কিন্তু অরবিন্দর গলা দিয়ে একটি কথাও বেরুলো না আর মাধুরী বিবর্ণ মুখে সেটি-র কোণে ব'সে ঘামতে লাগলো দৈবের নিষ্ঠুরতা স্মরণ ক'রে।

সুমিত্রা উঠে গিয়ে চা নিয়ে ফিরে এলো। অরবিন্দ ছু'চারবার কেশে চেষ্টা করলো আলাপ জমাতে—কিন্তুবারে-বারেই ব্যর্থ হ'য়ে চুপ ক'রে গেলো। সুপ্রকাশ এলো ভিতর

থেকে, 'আরে অরবিন্দ, তুমি যে একেবারে ভদ্রলোক হ'য়ে আছো। কথা-টথা বলো।'

অরবিন্দ যেন খেই পেলো সুপ্রকাশকে দেখে, 'কোথায় গিয়েছিলে তুমি?'

'এই তো এদিকে'—মাধুরীর দিকে তাকিয়ে বললো—'এঁর সঙ্গে আপনি আলাপ করুন, দেখবেন অদ্ভুত আমুদে মানুষ আমার বন্ধুটি।'

মাধুরী অতি কষ্টে একটু হাসলো এবং একটু পরেই বললে, 'আমার এবার যাওয়া দরকার, সুপ্রকাশবাবু।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, আমি নিজে গিয়েই তো আপনাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবো কথা দিয়েছি। একটু অপেক্ষা করুন দয়া ক'রে। দাসেদের পৌঁছিয়ে দিয়ে এক্ষুনি ফিরে আসবে আমার গাড়ি।'

'গাড়ির দরকার কী, আমি স্বচ্ছন্দে ট্র্যামে চ'লে যেতে পারবো।'

'না না, সে কী হয়। একটু বসুন দয়া ক'রে।'

'এত ব্যস্ত হয়েছিস কেন, বোস্ না আর-একটু'—ব'লে সুমিত্রা ব'সে পড়লো তার পাশে। অরবিন্দর দিকে তাকিয়ে

বললে, 'মিঃ দত্ত, ইনি আমার সহপাঠিনী ছিলেন, এখন সহকর্মিণী।'

অরবিন্দ বোকার মতো হাসলো।

'কিছুই খাচ্ছেন না আপনি'—সুমিত্রা আবার অনুযোগ করলো।

'না, না, খাচ্ছি বইকি—খাওয়া' বিষয়ে আমি একান্ত নির্লজ্জ।' বলতে-বলতে সে হঠাৎ তাকালো মাধুরীর দিকে।

মাধুরী নিমেষে চোখ নামিয়ে ফেললো তার মুখ থেকে এবং পরমুহূর্তেই সোজা দাঁড়িয়ে বললে, 'না ভাই, আমার আর দেরি করা চলে না—আমি ট্র্যামেই যাই।'

'আর-একটু, আর-একটু'—সুপ্রকাশ অনুনয় ক'রে বললো।

সুমিত্রা মৃদু হেসে বললে, 'তুমি আজকে আমাদের মাননীয় অতিথি, তোমাকে পৌঁছিয়ে দেবার সম্মানটুকু অন্তত আমাদের দাও।'

মাধুরী নিরুপায়ভাবে চুপ ক'রে ব'সে পড়লো। আর অরবিন্দ তক্ষুনি চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে বললে, 'সুপ্রকাশ, আমিও কিন্তু ভাই আর বসবো না আজ—মিস্ কর, অত্যন্ত দুঃখিত যে আপনার জীবনের এই শুভ-দিনটিতে আসতে পাবার

সৌভাগ্য লাভ ক'রেও আমি আরো খানিকক্ষণ আপনাদের সুমধুর সাহচর্য লাভ করতে পারলুম না'—বলতে-বলতে অরবিন্দ উঠে দাঁড়ালো—'অত্যন্ত অভদ্রতা, অত্যন্ত অসভ্যতা হচ্ছে বুঝেও আমি নিরুপায় হ'য়েই আপনাদের কাছে বিদায় নিতে বাধ্য হলাম—' হাতের ঘড়ির দিকে ব্যস্তভাবে চোখ বুলিয়ে—'নিশ্চয়ই আমাকে মার্জনা করবেন।'

'ও কী, এই তো এলে', সুপ্রকাশ অবাক হ'য়ে তার দিকে তাকালো, সঙ্গে সঙ্গে মোটরের হর্ন বাজলো গাড়ি-বারান্দায়। উৎকর্ণ হ'য়ে সুপ্রকাশ এগিয়ে এলো একবার দরজার সামনে—তারপরেই ফিরে এসে বললে, 'আচ্ছা, চলো।'

'আমি—আমি কেন—'

'নাও নাও, আর ভদ্রতা করতে হবে না,' সুপ্রকাশ তাকে ঠেলে এনে গাড়িতে ঢুকিয়ে দিলো—মাধুরীও এগিয়ে এলো নিঃশব্দে। 'আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম মিস মিত্র,' সুপ্রকাশ ভদ্রতা জানাতে-জানাতে ড্রাইভারকে নামিয়ে নিজেই ড্রাইভ করতে বসলো সামনে। ভিতরে মাধুরী আর অরবিন্দ অন্ধকারে পরস্পর পরস্পরের অস্তিত্বে নির্বাক হ'য়ে ব'সে রইলো।

গাড়ি রাসবিহারী এভিনিউ পার হ'য়ে যখন রসা রোডে

এসে পৌঁছলো, অরবিন্দ অত্যন্ত আস্তে, প্রায় কানে-কানে বলার মতো ক'রে ডাকলো, 'মাধুরী।'

মাধুরী কাঠ হ'য়ে গেলো অরবিন্দের ডাক শুনে। 'আমি বলছিলাম কী—' অরবিন্দ বিপন্নের মতো বললো, 'আমাকে তুমি ভুল বুঝো না, কালকে যে বৌদি গিয়েছিলেন তোমাদের ওখানে সে-কথা আমি জানতাম না।'

মাধুরী নিঃস্পন্দ।

অরবিন্দ—যাতে শোনা না যায় এ-ভাবে সুপ্রকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে বললো, 'তোমাদের এনগেজমেন্টের কথা শুনলাম—।'

'এনগেজমেন্ট!'—মাধুরীর গলা চিরে শব্দ বেরুলো।

'কী হ'লো?' সুপ্রকাশ চালাতে-চালাতে মুখ ফেরালো। সে কথাটা শুনতে পায়নি, কিন্তু অদ্ভুত ভাঙা আওয়াজটা শুনেছিলো।

'কিছু না, ধন্যবাদ,' মাধুরী হাসি টেনে বললে।

অরবিন্দ একটু অপেক্ষা ক'রে আবার নিচু স্বরে বললে, 'হ্যাঁ, এনগেজমেন্ট না হ'য়ে গেলেও তোমরা উভয়ে যে বিবাহে ইচ্ছুক এ-কথা আমি শুনেছি। তুমি একটুও দ্বিধা কোরো না, মাধুরী। আইনত বলপ্রয়োগ ক'রে তোমার উপর আমি দাবি

জানাতে পারি, কিন্তু আমাকে ততটা বর্বর যদি মনে না করো তাহ'লে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। এতটুকু কেলেঙ্কারিও আমি করবো না এই নিয়ে। তোমার বিয়েতে আমি সত্যি সুখী হবো, বিশ্বাস কোরো।' অরবিন্দ চুপ করলো। মাধুরী কিছুই বুঝতে পারলো না ওর কথার তাৎপর্য। বিবাহের কথাটা ইনি কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন? একবার বিবাহ ক'রেই কি তার যথেষ্ট শিক্ষা হয়নি? দু'বার তার ঠোঁট নড়লো অরবিন্দকে কোনো কথা বলবার জন্য, কিন্তু বলা হ'লো না।

মাধুরীর বাড়ির দরজায় গাড়ি এসে থামতেই সুপ্রকাশ নেমে দরজা খুলে দিয়ে হেসে বললে, 'নিন, এইবার আপনার শাস্তি।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।' মাধুরী একটু ভদ্রতা ক'রেই বিদায় জানালো। সুপ্রকাশ আবার গাড়ি ছোটালো অরবিন্দর বাড়ির দিকে।

বাড়ি ফিরে অরবিন্দর যে কী হ'লো, ভালো ক'রে খেতে পারলো না, ঘুমুতেও পারলো না রাত্তিরে। তিন দিন পরে আপিশে গিয়ে পুরু এক খামে মাধুরীর লেখা এইটুকু এক চিঠি পেলো।

'মাননীয়েষু—আপনি যা শুনেছেন তা যে একান্তই মিথ্যে কথা তা জানাবার জন্যই আমাকে আজ এই চিঠিখানা লিখতে হ'লো।

মাধুরী মিত্র।'

অরবিন্দ একবার, দু'বার, তিনবার, বোধ হয় লক্ষবার ঐ কথা কয়টি পড়লো তারপর চিঠিখানা অতিশয় সযত্নে ভাঁজ ক'রে বুক-পকেটে রেখে কাজে মন লাগাবার চেষ্টা করলো। আপিশের মধ্যে দশটা থেকে ছ'টা পর্যন্ত সময় যে তার কী ক'রে কেটেছিলো তা সে নিজেও জানে না—এক সময় প্রকৃতিস্থ হ'য়ে নিজেকে সে মাধুরীদের হরিশ মুখার্জি রোডের দরজার কড়া নাড়তে দেখে অবাক হ'য়ে গেলো। ঘন-ঘন পকেট থেকে রুমাল বা'র ক'রে কপাল মুছলো, ঘাড় মুছলো এবং ব্যাকুল-ভাবে মাথার চুলের মধ্যে দিশাহারা হ'য়ে আঙুল চালাতে লাগলো।

দরজা খুলে দিয়ে অরবিন্দকে দেখে মাধুরী একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো। মিনিটখানেক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে বললে, 'কাকে চান?'

'তোমার মা বাড়ি নেই, মাধুরী?' অরবিন্দ ক্ষীণ গলায় বললো।

'না।'

'ও'—একটু চুপ ক'রে থেকে অরবিন্দ বললে, 'তাঁর সঙ্গে দেখা হয় না?'

'না'—একটু থেমে—'কথা থাকলে আমাকেও ব'লে যেতে পারেন।'

'রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলবো?' হঠাৎ যেন সহজ সুর ফিরে এলো অরবিন্দর গলায়। অনুমতির অপেক্ষা না-ক'রে ঘরে এসে বসলো সে। 'আমাকে যদি অস্বীকারই করতে পারো, মাধুরী, তবে আচরণটা একটু ভদ্রভাবে করাই তো উচিত।'

মাধুরী নতমুখে দাঁড়িয়ে রইলো দেয়াল ঘেঁষে।

'বোসো না, বাঃ'—তারপর একান্ত স্বাভাবিক হ'য়ে বললো, 'শোনো, সত্যি বলতে তোমার মার সঙ্গে আমার কিন্তু একটুও দরকার নেই—আর আমি যে এখানে কেন এসেছি কার কাছে এসেছি তাও বলা শক্ত। আপিশ শেষ ক'রেই কালিঘাটের ট্র্যামের ভিড়ে বাদুড়ের মত ঝুলতে-ঝুলতে চ'লে এলাম। এক গ্লাশ জল খাওয়াবে?'

'চা খাবেন?'—মাধুরীর মৃতের মতো রক্তহীন ঠোঁট ফাঁক হ'য়ে কথা বেরুলো।